প্রথম অধ্যায়

কবিশেখর কালিদাস রায়ের জীবন কথা॥

১.

কবিশেখর কালিদাস রায়ের নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কাব্য, সমালোচনা, ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তাঁর রচনাবলীর বিশালতা ও বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিনয় ঘোষ একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন "বাংলা কাব্যে আপনার ও শ্রদ্ধেয় শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিকের স্থান স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না করলে তো ইতিহাসের বিকৃতি করা হবে।" [১] তাঁর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ শুনে মন্মথ রায় তাঁকে লিখেছিলেন "আপনি এই পুরস্কার পাওয়ায় রবীন্দ্রপুরস্কারের হৃত মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।" [২] দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ চর্চা করে গেছেন তিনি। ১৩১৫ সালে 'কুন্দ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁর যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে যাত্রা অব্যাহত থেকেছে।

কবিশেখর রায় ছিলেন মানব জীবনের সহজ সরল সুখ দুঃখের নিপুণ ভাষ্যকার। জটিল দ্বন্দ্ব সংকুল আধুনিক জীবনের ভাষ্য রচনা করেন নি, মনোলোকের গভীর অতল রহস্য উদ্ঘাটনের কাজ করেননি তিনি, কোন অশুভের অমঙ্গলের অনৈতিকের রূপায়ণও তাঁর রচনায় দেখা যায় না। তাঁর কাব্যে মানুষের দৈনন্দিন সুখ দুঃখের হাসি কান্নার উচ্ছল প্রকাশ ঘটেছে। মানুষের মহত্ত্বের প্রতি অবিচল আস্থা, জীবনের সহজ সৌন্দর্যের প্রতি আন্তরিক নির্ভরতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সুকুমার উপস্থাপনা তাঁর কাব্যের সাধারণ ধর্ম। উনিশ শতকে যে বাংলা কাব্য ধারা গড়ে উঠেছিল। কবিশেখর মনোধর্মের দিক থেকে ছিলেন তারই উত্তরসূরী। জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস, তাঁর ভালোমন্দ দুইকে গ্রহণ করবার শক্তি, কোন মনোগত জীবন বোধ নয়, জীবনের সহজ সত্যকে দুবাহু মেলে ধরবার আগ্রহ, এ সবই তাঁর কাব্যে আমরা পাই। সুখ

দুঃখ হাসি কান্না মিশ্রিত যে জীবন-স্বাদ উনিশ শতকের কবিদের রচনায় আমরা পাই, কালিদাসের কাব্যে সেই জীবনস্বাদ আমরা অনুভব করি। কালের দিক থেকে তিনি ছিলেন রবীন্দ্র পরবর্তী। সেখানে রবীন্দ্রানুসারী হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র হারান নি। একাধারে কবি, পণ্ডিত, ছান্দসিক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক সাহিত্য সমালোচক, বৈয়াকরণ, ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম ব্যাখ্যাতা ছিলেন কালিদাস রায়। বাংলা কাব্য জগতে তাঁর অবদান বাঙালী জাতি শ্রদ্ধায় এবং ভালোবাসায় স্বীকার করে নিয়েছে। কবিশেখর উপাধি তাঁর পক্ষে সার্থক।

বাংলা কবিতার রীতি বদল ঘটবার ফলে কাব্যক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব হ্রাস পায়। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবের মধ্যে থেকেও তিনি কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কালের জটিল জীবনাবর্ত যাঁদের রচনায় অভিব্যক্তি লাভ করল তাদের জীবন বোধ আর কাব্য প্রকরণ রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজকে পিছনে ফেলে এল। দুই বিশ্বযুদ্ধ, দেশ-ভাগ নবীন রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা আধুনিক কবিদের যে ভুবনে নিয়ে গেল, কালিদাস-দের সঙ্গে তার শত যোজন পরিমাণ ব্যবধান। তিনি নিজে 'বৈকালী' কাব্যগ্রন্থের পরিচায়িকা অংশে লিখেছিলেন : 'বর্তমান সাহিত্যিক সমাজে এ সকল কবিতার সমাদর নাই তাহা আমি জানি। যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য রসাদর্শের পরিবর্তন হইয়াছে।" [৩] তবু বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে কবিশেখরের একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী আসন আছে। সেই স্বতন্ত্র কবিসত্তাকে জানবার জন্য প্রথমে কবিকে জানা চাই। প্রসঙ্গত মনে করতে পারি কবি দীনেশ দাসের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি মন্তব্যের কথা তিনি 'কবিশেখরের তিরোধানে' নামক একটি স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> এই প্রাণময় মানুষটির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকার জন্যেই বোধহয় তাঁর কাব্যকে আত্মস্থ করা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। কারণ কবির জীবন যেমন তাঁর কাব্যে প্রকাশিত, তাঁর কাব্যও তেমনি অনেক সময় জীবনের মধ্যে রূপায়িত। তাই কবি জীবন ও কাব্য জীবনকে এক সূত্রে গেঁথে দেখতে পারলে বিচার প্রায় নির্ভুল হয়। [৪]

২.

সাহিত্য বিচারের সমাজনির্ভর সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত করেছিলেন সম্ভবত Hippolyte Adolph Taine(128-93) । তাঁর বক্তব্যে জাতির সমাজের এবং সময়ের আকাঙ্খার যৌগপত্যে সাহিত্য বিচারের ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সমাজ ও সময়ের শৃঙ্খলায় সব কবি সাহিত্যিকের রচনার মূল্য অনুধাবন করা যাচ্ছিল না। এলিজাবেথীয় সমাজ ও সময়ের পটভূমিতে সেক্সপীয়রের নাটক গুলির বিচার সম্ভব হলেও বেন জনসনের প্রতিভার মূল্যায়ন হয়ত করা যায় না। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমের বিচার সম্ভব হলেও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন সম্ভব কি না ভেবে দেখতে হবে। কেন একই সমাজ পটভূমিতে জন্মগ্রহণ করেও দুজন সাহিত্যকারের রচনা পৃথক হয়, সে কথা ভাবতে গিয়ে লেখকের ব্যক্তি জীবনের দিকে চোখ মেলে তাকানো শুরু হল।

ইংরেজি সাহিত্যে জীবনী নির্ভর, সমালোচনার আরম্ভ সম্ভবত জনসনের কবি-জীবনী (Johnson : Lives of the poets)।[৫] আমাদের বাংলা সাহিত্যে এরকম কাজ প্রথম করেছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত। তিনিও কবি জীবনী রচনা করে পুরোন বাংলা সাহিত্যের কবিদের একটি পরিচায়িকা রেখে গিয়েছিলেন। কবি জীবনীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বঙ্কিমের বহু উদ্ধৃত উক্তিটি আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি। ঈশ্বর গুপ্তের জীবন কথা ও কবিত্ব প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছিলেন : " কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।" [৬] এ দেশে সমাজ ভিত্তিক সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত এক অর্থে বঙ্কিমই করেছিলেন। কাব্য বিচারে জীবনীর মূল্য সম্বন্ধে সাঁতবোভের একটি উক্তি এখানে স্মরণ করা যায়। তিনি মনে করতেন কবির জীবনী ব্যতীত তাঁর কাব্য বিচার কঠিন (it is difficult for me to judge it without knowledge of the man who wrote it)[৭] রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছিলেন 'কবিকে পাবে না কবির জীবন চরিতে'।[৮] অন্যপক্ষে বঙ্কিম কবিতার মধ্যেই কবিকে খুঁজেছিলেন,

"কবিতা দর্পন মাত্র, তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে।" [৯] আমরা মনে করি কবির জন্য আস্বাদন করবার পক্ষে জীবনীর উপযুক্ততা তেমন নাও থাকতে পারে কিন্তু তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পক্ষে তা দরকারি। কবির বহির্জীবন আর অন্তর্জীবনের একটি যোগ সূত্রও হয়ত এভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় প্রদেশ কংগ্রেসের সম্বর্ধনার উত্তরে কবি বলেছিলেন : " আমার জীবনের সঙ্গে আমার কবিতার গভীর সংযোগ আছে।" [১০]

৩.

কবিশেখর কালিদাস রায় জন্মেছিলেন সেকালের একটি গ্রামীন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বর্ধমানের কড়ুই গ্রামে। কবির পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কোগ্রামে। অজয় নদীর ভাঙনের জন্য তাঁরা কোগ্রাম থেকে পালিগ্রামে চলে আসেন। সেখান থেকে তাঁরা কড়ুই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এই কড়ুই গ্রামে ১২৯৬ সালের ৭ই আষাঢ় ইং ১৮৮৯ সালের ১৯ই জুলাই কবির জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম যোগেন্দ্রনারায়ন রায়। মার নাম রাজবালা দেবী।

কবিশেখর কালিদাস রায়েরা ছিলেন বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের অনুজের বংশধর। এ সম্পর্কে তিনি স্মৃতি কথায় লিখছেন - "তাঁহার (লোচনদাসের) বংশধর আমি নই। লোচন ছিলেন নিঃসন্তান। যৌবনেই সংসার ত্যাগী।" [১১] রায় পরিবারের কয়েক পুরুষের বংশ তালিকাটি নিম্নে দেওয়া হল।

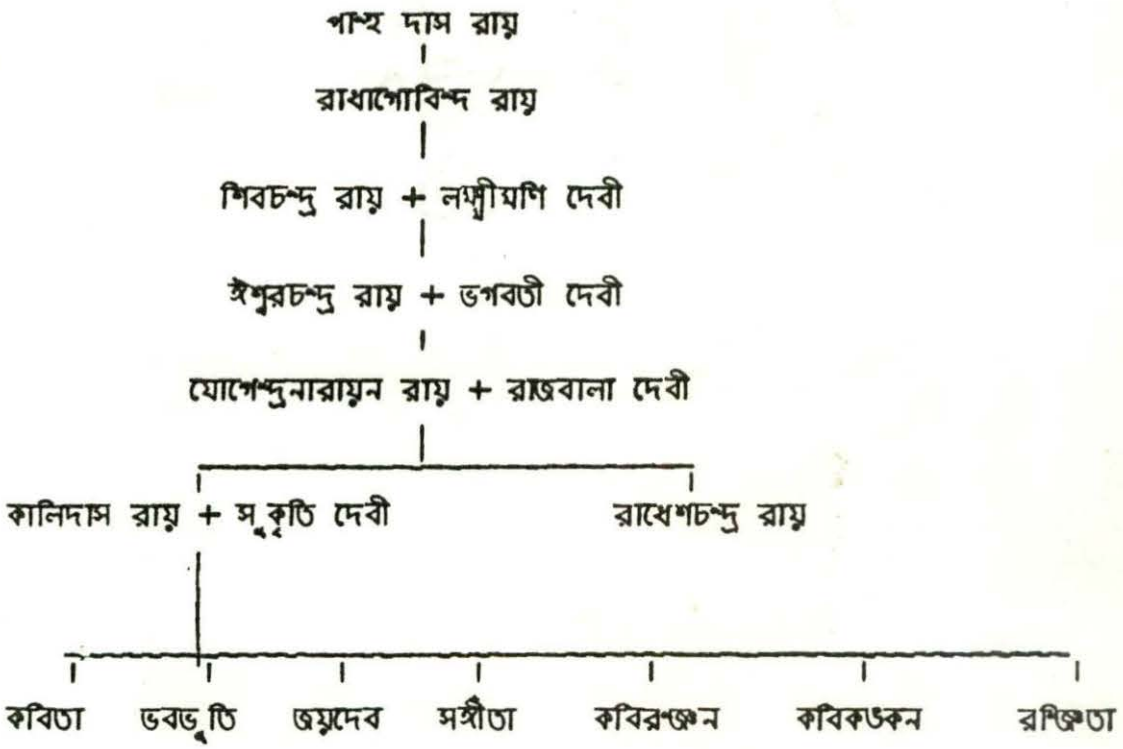

তাঁর পিতামহী ভগবতী দেবী ছিলেন 'পদকল্পতরু' সঙ্কলয়িতা গোকুলানন্দ সেনের বংশের কন্যা আর মাতামহী চৈত্রার পদকর্তা উদ্ধবদাসের বংশের কন্যা।[১২] কালিদাসের প্রপিতামহ শিবচন্দ্র ও পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র যশোর জেলায় বাদ্মনডাঙা নীলকুঠীতে মেকেঞ্জি সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র পুত্র যোগেন্দ্রকে নীলকুঠীর চাকরীতে ঢোকাননি। যোগেন্দ্রনারায়নের বাল্য ও শৈশব প্রায়েই কেটেছে। পনের বছর বয়সে মাত্র পাঁচ টাকা বেতনে তিনি একটি জমিদারী এস্টেটে কাজ করতে ঢোকেন। পরে কাশিম বাজারে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর এস্টেটে মীরমুন্সীর পদে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি ৭২ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করেছেন। ১৯৩৪ খ্রী. ৮৬ বৎসর বয়সে কলিকাতার রাজা বসন্ত রায় রোডের ভাড়া বাড়ীতে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজবালা দেবীর মৃত্যু হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে।

কালিদাস যোগেন্দ্রনারায়ণ ও রাজবালার অষ্টম সন্তান। প্রথম সাতটি সন্তান অকালে সূতিকাগারেই মারা যায়। মা কালীর কৃপায় তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম রাখা হল কালিদাস। যোগেন্দ্র নারায়ণের নবমপুত্র রাধেশচন্দ্র। তাঁদের দশম পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়েছিল। রাধেশচন্দ্র রায় বয়সে কবির চেয়ে দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। কিন্তু তিনিই ছিলেন রায় পরিবারের সাহস ও বলের আশ্রয়। ভগ্ন স্বাস্থ্য বৃদ্ধ দাদাকে রেখে রাধেশচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যু ঘটায় কালিদাস ভেঙে পড়েছিলেন। সাহিত্যিক না হলেও রাধেশচন্দ্র কবির সাহিত্য প্রকাশে সাহায্য করতেন।

৪.

কালিদাস প্রথম পাঁচ বছর মা বাবার কাছে কাশিমবাজারে কাটিয়ে গ্রামে ফিরে এলেন। সেখানে কাশিমবাজারে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল অত্যধিক। সেখানে তিনি ভুগছিলেন বলে গ্রামে বিধবা পিসি আর কাকা কাকীমার কাছে তাঁকে রেখে যাওয়া হল, কাকীমা তাকে মানুষ করেছেন। নিজের এই অবস্থার কথা একটি কবিতায় লিখেছেন :

লালিত হইনি শুধু মায়েরই ক্রোড়ে। পিসীমা তুলিল মোরে মানুষ করে।
যতদিন দড় মোর হয়নি ডানা। কাকীমার নীড়ে ছিনু কোকিল ছানা॥ [১৩]

গ্রামে তাঁর পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বাড়িতে বহু সংখ্যক প্রতিপাল্য থাকতেন। দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন করতেন তিনি। রায় বাড়ি তখন দু অংশে বিভক্ত ছিল। রাস্তার এক পাশে ছিল ভদ্রাসন আর অন্যদিকে খামারবাড়ি। খামারবাড়িতে ধানের গোলা ছিল। বৈঠকখানা গ্রামের লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন। এই বৈঠকখানা বাড়িতে একটি পাঠশালা ছিল। দূরপথ যাত্রীরা মাঝে এই বৈঠকখানা ঘরে এক রাতের বিশ্রাম করে আবার পথ চলত।

রায় বাড়ির জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের। তখন গ্রামের ধনী লোকেরাও অতি সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। মোটা ভাত মোটা কাপড়েই লোকেরা দিন কাটাত। সাধারণত লোকের গায়ে জামা উঠত অন্য কোন জায়গা যেতে হলে। জুতোর বালাই বিশেষ ছিল না। গ্রামে শিক্ষার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। অধিকাংশ লোকই ছিলেন খুব দরিদ্র। তার উপর মদ্যাসক্তি পারস্পরিক হিংসা ঈর্ষা বিবাদ বিসংবাদ লেগেই ছিলো। জীবিকা বলতে ছিল চাষ-বাস। কেউ কেউ উপরি পৌরোহিত্য করত। তবে গ্রামে মোটের উপর শান্তি ছিল। কীর্তনগান এবং যাত্রা এই ছিলো যুগপৎ গ্রামীন শিক্ষা এবং বিনোদন।

গ্রামে এসে কালিদাস অসুস্থতার জন্য প্রথম কিছুদিন প্রায় গৃহবন্দী ছিলেন। এখানেও খাওয়া দাওয়ার উপরে ছিল নিষেধাজ্ঞা। বাড়িতে ভাত মুড়ির ছড়াছড়ি, তবু ঠিক খেতে পান না তিনি। শারীরিক দুর্বলতার অজুহাতে খেলাধুলোও করতে পারেন না। জানালার ধারে বিছানায় বসে বা শুয়ে তার দিন কাটত। মনের চলিষ্ণুতা বাইরের স্থিতিকে হয়তো মানিয়ে নিয়েছিল। মাস ছয়েক পরে তিনি একটু সুস্থ হন। তখন তাঁকে গ্রামের শশি দৈবজ্ঞের পাঠ-শালায় ভর্তি করে দেওয়া হল। শিক্ষক শশি দৈবজ্ঞ কোন চাষীর উঠোনে, কখনো কোনো গাছ-তলায়, আর বর্ষাকালে চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা চালাতেন। পাঠশালার শিক্ষা পদ্ধতি আর শাসন ব্যবস্থা 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে 'পথের পাঁচালী' পর্যন্ত একইরকম ছিল। ছাত্ররা পণ্ডিত মশায়ের কঠোর শাসনে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করত। কবির স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারা যায় সে সময় পাঠশালায় তালপাতার ক্লাস, শ্লেটের ক্লাস এবং কাগজের ক্লাস - এই তিন ধরণের ক্লাসের প্রচলন ছিল। তালপাতার ক্লাসে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ, শ্লেটের ক্লাসে দ্বিতীয় ভাগ এবং ধারাপাত আর কাগজের ক্লাসে শিশুশিক্ষা, শুভঙ্করী এবং কথামালা পড়ানো হত। ছাত্ররা, চাটাই শরের কলম, কালির দোয়াত এবং জলখাবার হিসেবে মুড়ি নিয়ে পাঠশালায় যেতো। মাসের শেষে গুরুমশাইকে বেতন-স্বরূপ সাধ্যমত সিধা দিত। অভিভাবকদের কেউ পড়াশোনার খবর নিত না। তবু শিক্ষকমশাই-এর পড়ানোর কোন ত্রুটি ছিল না। এই পাঠশালায় কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরধুনী কবিতাটি শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। এই কবিতাটির সুর ও ছন্দ তাঁর পরবর্তী কাব্য রচনার আদি প্রেরনা বলা যেতে পারে। পাঠশালায় পড়া শেষ করে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলের প্রধান পন্ডিত ছিলেন নর্মাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়া। তাঁর বেতন ছিল ১৮ টাকা। পাঠ্য পুস্তক হিসেবে এখানে 'কথামালা', 'চরিতাবলী', আখ্যানমঞ্জরী', 'চারুপাঠ', যদু গোপালের 'পদ্যপাঠ', রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙলার ইতিহাস' পড়তে হত। ইংরেজির একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর নাম দুর্গাগতিবাবু, ১৮৭৯ সালে কবির যখন ১০ বৎসর বয়স তখন এটি মাইনর স্কুল (M.E. School)এ পরিণত হয়। এখানে কবির ইংরাজী পড়া শুরু। এখানে পড়বার সময় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'ভাগবত' কিছু কিছু পড়েছিলেন। কখনো কখনো এগুলি পড়ে তাঁর পিসীমাকে শোনাতেন। ১৯০১ সালে তাঁর বাবা তাঁকে বহরমপুরে নিয়ে যান। সেখানে তিনি খাগড়া লন্ডন স্কুলে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। গ্রাম ছেড়ে যাবার সময় তাঁর মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। স্মৃতিকথায় লিখছেন :

> গ্রামের পড়া শেষ হল - শহরে গেলাম Entrance school -এ পড়বার জন্য। গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে কি ব্যথাই না পেয়েছিলাম। ... গাঁয়ে থাকতে গাঁয়ের মর্যাদা বুঝিনি। আমার গ্রামকে আমি এতই ভালবাসতাম যে গ্রাম ছেড়ে সেই বয়সে বাপ-মার কাছে যেতেও আমার বিন্দুমাত্র আনন্দ হয়নি।[১৪]

৫.

বহরমপুরে গিয়ে তিনি খাগড়া লন্ডন মিশন স্কুলে ভর্তি হলেন। স্কুলটি ছিল ভবানীপুর লন্ডন মিশন স্কুলের শাখা। এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন রেভারেন্ড কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। ইনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহপাঠী ছিলেন। এখানে পাঠ্য বিষয়গুলির সবই ইংরেজি ভাষা মাধ্যমে পড়ানো হত, আলাদা বিষয় হিসাবে বাংলা পড়ানো হত না। সংস্কৃত বিষয়ের

মধ্যে ২০ নম্বরের একটি বাংলা রচনা লিখতে দেওয়া হত। শিক্ষকরা প্রত্যেক দিন ক্লাসের পড়া মুখস্থ ধরতেন। বছরে তিনটি পরীক্ষা হত, বাৎসরিক ফল দেখে ছাত্রদের পুরস্কার বিতরন করা হত। কালিদাস প্রথম স্থান অধিকার করে অনেক পছন্দ মত বই পুরস্কার পেয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে সেক্সপীয়র, কোলরীজ, গোল্ডস্মীথ, কীটস্ টেনিসন প্রমুখের রচনাবলী ছিল। সে সময় বিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করলে পর বছরে বেতন দিতে হত না। কালিদাস খাগড়া স্কুলে প্রথম তিন মাস মাত্র পাঁচসিকে করে বেতন দিয়েছিলেন।

কাশিমবাজারের স্মৃতি কবির জীবনে অবিস্মরণীয় হয়েছিল। তাঁর স্মৃতি কথায় তিনি কাশিমবাজারকে বাল্য ও কৈশরের 'লীলাভূমি'[১৫] বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি বাবা মা ও ভাইদের সঙ্গে রাজবাড়ীর কাছে একটি বাড়িতে ছিলেন। পরে সেখান থেকে পুরাতন একটি বাড়িতে উঠে যায়। এই বাড়িটি রেশমকুঠী বাড়ি ছিল। এই বাড়ির স্মৃতিও তাঁর কবিতায় আছে। তিনি কৈশোরের স্মৃতি নামে একটি কবিতায় লিখেছেন :

খাঁটি গঙ্গা হল বিল কাটি গঙ্গা অপনাম ধরে।
জীবন মোর তার তীরে যাপিনু কৈশোরে,
জীর্ণ গেহে, শীর্ন দেহে। [১৬]

কাশিমবাজারের বাড়ি থেকে তাঁর স্কুল ছিল প্রায় দু-মাইলের পথ। তিনি প্রথম কিছু দিন রাজ-বাড়ির দুই ধনী সঙ্গীর সাথে গাড়ীতে স্কুলে যেতেন। কিন্তু সেই ছেলেরা গাড়ীতে তাঁকে নানা রকম অপমান করত। কবি লিখেছেন :

তাঁরা অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে। তারা আমি যে সীটে একা বসতাম সেই সীটে পা তুলে দিত ... আমাকে খুব ঘৃণা করত। আমি পড়াশুনায় ভালো ছিলাম বলে good boy বলে ব্যঙ্গও করত।[১৭]

এর ফলে তিনি গাড়ী ছেড়ে দেন, হেঁটেই স্কুল যাতায়াত করতে থাকেন। এই পথের স্মৃতি তাঁর 'বিদ্যালয়ের পথে' নামক কবিতায় তিনি ধরে রেখেছেন।

বাবলা ফুলের গন্ধে সেই পথখানি পড়ে মনে
সেই শীর্ণ পথ ধরি চলিতাম কৈশোর জীবনে
বিদ্যালয় পানে নিত্য।[১৮]

তিনি যে পথে স্কুলে যেতেন সেটা ছিল বনপথ। এই বনপথে মনের আনন্দে হেঁটে স্কুলে যাওয়া আসা করতেন।

যে পথে স্কুলে যেতাম সেটা বনপথ। সাবধান হয়ে চলতে হত না। সমস্ত পথ আমার কল্পনা বিলাসেই কেটে যেত, পথশ্রান্তি একেবারেই অনুভব করতাম না। পথটা ফুরিয়ে গেলে মনটা খারাপ হয়ে যেত, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ত। কারণ পথ ফুরালেই স্কুল। ফিরবার সময়ও তাই। পথ ফুরালেই নিঃসঙ্গ নিরানন্দ গৃহ। গৃহ ও স্কুল - দুটোর চেয়ে মুখরিত সুরভিত ছায়াচ্ছন্ন পথটা ঢের বেশী প্রিয় ছিল।[১৯]

কাশিমবাজারে কালিদাসের কোন বন্ধু বান্ধব বা খেলার সঙ্গী ছিল না। এখানে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে বাধ্য হতেন। তাছাড়া বাড়ীতে সব সময়ই কারো না কারোর অসুখ বিসুখ লেগেই থাকত। প্রায় প্রতিদিন সকালে দাতব্য চিকিৎসালয়ে কারো না কারোর জন্য ওষুধ আনতে যেতে হত। বৈকাল বেলায় ক্রীড়া সঙ্গীর অভাবে কখনো খেলাধূলা করা হয় নাই। নিজের এই সময়কার মানসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন :

অবজ্ঞাত দৈন্য সংকুচিত নির্বান্ধব কিশোর আমি। ধনি গৃহের আশ্রিত কিশোরদের অবজ্ঞার পাত্র আমি নিঃসঙ্গ।[২০]

এই নিঃসঙ্গতা মোচনের জন্য তিনি আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়তে ভর্তি হয়েছিলেন। তবু তাঁর নিঃসঙ্গতা ঘোচেনি। এই নিঃসঙ্গতা মোচনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে তিনি 'অন্তরঙ্গতা' স্থাপন করেছিলেন। আর তার সঙ্গে প্রকৃতির এই ঘনিষ্টতায় তাঁর চিত্তে কবিত্বের স্ফুরণ ঘটেছিল। কাশিমবাজারের খোলা মাঠে, গঙ্গার ধারে, গোরস্থানে তিনি একাকী ঘুরে বেড়াতেন। আকাশ

পাতাল ভাবতেন। তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি এমন কি দীর্ঘ জীবন লাভের আশাও পোষন করতে পারতেন না। "সমস্তই শূন্যময় মনে হইত - সেই শূন্য কল্পনা দিয়া ভরিয়া দিতাম। এরূপ ক্ষেত্রে কবিতা লেখা ছাড়া উপায় ছিল না।" [২১]

কাশিমবাজারে রাজবাড়িতে সারা বছর নানা উৎসব লেগেই থাকত। পূজাপার্বন আমোদ প্রমোদ কীর্তন-কথা যাত্রা কবিগান ইত্যাদির ছাড় ছিল না। এখানে তিনি ছোট বেলাতেই কলকাতার অনেক থিয়েটার দেখেছিলেন।

কাশিমবাজারে থাকতে তাঁর প্রতিবেশী তাঁরই সমবয়সী একটি কিশোর ললিতমোহন ভায়ের সঙ্গে ঘনিষ্টতা হয়েছিল। এই বন্ধুটির কাছ থেকে নিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র এবং সঞ্জীবচন্দ্রের কিছু কিছু বই পড়েছিলেন। এদের বাড়ি থেকে নিয়ে তিনি অনেকগুলি পত্র পত্রিকা - 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'প্রবাহ', 'নবজীবন' ইত্যাদি দেখেছিলেন।

১৯০৬ সালে এখান থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। বহরমপুরের পুরাতন সৈন্যাবাস গুলির তখন নানা সরকারী কাজে লাগত। এই বাড়ির একটিতে তখন ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছিল। পরীক্ষার তিনমাস পর ফল প্রকাশিত হয়। তিনি সরকারী বৃত্তি সহ এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন।

কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে তাঁর একটি মুশকিল হল। কাশিমবাজার হতে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ অনেকটা দূর। পায়ে হেঁটে যাওয়া আসাও ছিল অসম্ভব। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র তাঁকে শিবপুরে ওভারসিয়ারী পড়বার কথা বলেছিলেন। এর সমস্ত ব্যয়ভারও নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কালিদাসের সে ইচ্ছা ছিল না। রাজকুমার মহিমচন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় তিনি রাজবাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে একই গাড়ীতে কলেজে যাওয়া আসা করতেন। কলেজে গিয়ে তিনি ই·এম·ইলারর ছাত্র হলেন। এই আচার্যের কাছে তিনি সাহিত্য সাধনার জন্য বহুভাবে ঋণী ছিলেন তা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সাহেবের ছাত্রত্ব লাভের সৌভাগ্য না পাইলে আমার রচনা শক্তিটুকু অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত।" [২২] এখানে পড়বার সময় তাঁর কিছু বন্ধুও লাভও হয়েছিল।

এখান থেকে তিনি এফ্-এ পাশ করে বি•এ• ক্লাসে ভর্তি হন। বি•এ ক্লাসে তিনি দর্শন শাস্ত্রে অনার্স ছেড়ে দেন। তিনি যে কারণগুলি পরে স্মৃতি কথায় বলেছেন সেগুলি হল, উচ্চাকাঙ্খার অভাব, পড়াশুনায় উদাসিন্য, ভগ্নস্বাস্থ্য এবং কবিতা রচনার নেশা। তিনি বলেছেন, উচ্চাকাঙ্খার অভাবেই প্রধানত তিনি পড়াশুনায় বিশেষ মন দেন নি। ভগ্নস্বাস্থ্য একটা বড় কারণ ছিল। সে সময় প্রায়ই তাঁর সর্দ্দি কাশি লেগে থাকত। নাক দিয়ে এবং কখনো কখনো মুখ দিয়ে রক্ত পড়ত। তাঁর ধারণা হয়েছিল তিনি যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কীটসের কবিতা, জীবনী এবং মিসেস উডের যক্ষ্মা রোগীর বহু বর্ণনা তিনি পড়েছিলেন। কবিতা রচনা তখন চলছে, আর তাঁর মনে হচ্ছে এর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তুচ্ছ। এসব কারণে পড়াশুনায় খুব মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

কলেজে পড়বার সময় তাঁরা কাশিমবাজার থেকে সৈদাবাদে উঠে এসেছিলেন। কাশিমবাজারের প্রকৃতিই ছিল একমাত্র বন্ধু। সৈদাবাদে কলেজের অনেক বন্ধু পেয়েছিলেন। তিনি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। এখানে কবির বন্ধু শরদিন্দু রায়ের সঙ্গে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এরা দুজনেই অধ্যাপক হুইলারের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি ডিস্টিংশন্ সহ বি•এ• পাশ করেন। কলেজে পড়বার সময় তাঁর প্রথম কবিতার বই 'কুন্দ' প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১১ সালেই তিনি কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্রে এম•এ•পড়বার জন্য ভর্তি হলেন। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র তাঁকে আইন পড়াতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি রাজি হননি। কলকাতা গিয়ে তিনি ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের সভ্য হলেন। সেখানে মেরিগোল্ড ক্লাবের সদস্য হলেন। ক্লাবের সদস্যরা চন্দ্রগুপ্ত নাটক অভিনয় করলে 'দ্যুলোক ভূলোক প্লুকে' আলোকে'গানটি লিখে দেন। সেখানে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। কলকাতা ইনস্টিটিউট

হলের বাইরে গাঁদা ফুলের বাগানের মাঝে বেঞ্চিতে বসে তাদের আড্ডার আসর বসত। তাই এই আড্ডাকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন মেরিগোল্ড ক্লাব। মেরিগোল্ড ক্লাবের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাঁদের লক্ষ্য ছিল অর্থকরী কোন জীবিকা অবলম্বন করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ ও কার্যক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করা। কিন্তু 'আশ্চর্যের বিষয়' কালিদাস নিজের সম্বন্ধে লিখছেন :

> এঁদের সাহচর্যে আমার মনে সেদিক দিয়ে কিছু মাত্র উৎকণ্ঠা জাগল না। আমার উৎকণ্ঠা ছিল ঐ 'প্রবাসী', 'ভারতী' দলের উৎকণ্ঠার সঙ্গে অভিন্ন[২৩]।

এ সময় ছোট ছোট কতকগুলি কবিতা নিয়ে 'কিশলয়' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। কলকাতায় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার মরীচিকার পিছনে যখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সে সময় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী তাঁর পরম হিতৈষী রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁকে একদিন মৃদু তিরস্কার করে পড়াশুনায় মন দিতে বললেন। পড়াশুনায় মনও দিলেন তিনি, কিন্তু বেশীদিন সেই মনোযোগ স্থায়ী হল না। তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন প্রতিদিন বিকেলে চোখ জ্বালা করে, জ্বর আসে, ভোর বেলায় জ্বর ছেড়ে যায়। বুকে পিঠে ব্যথা এবং খুক্ খুক্ করে কাশি। ক্রমে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন।"মনে হইল আমার বোধ হয় পাকা-পাকি টি বি হইল।" [২৪] সাহস করে ডাক্তারের কাছে যেতে পারলেন না। কবিরাজের ওষুধ খেতে লাগলেন তাতেও কোন ফল হল না। তখন মাতৃ সম্পর্কের দূর আত্মীয় গজেন্দ্র কবি-রাজের কাছে গেলেন। তিনি অনেকক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন "সাংঘাতিক কিছু নয়, কলকাতার জলবায়ু তোমার সহ্য হচ্ছে না। তুমি অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে চলে যাও। আর কিছু করতে হবে না।" [২৫] তখন কবি কিছু দিন তাঁর এক বন্ধুর কাছে মধুপুরে গিয়ে থাকলেন। মধুপুরের জল হাওয়ায় তাঁর শরীরের গ্লানি দূর হল। শরীর একটু সুস্থ হল। অকাল মৃত্যু ভয় কেটে গেল। মধুপুর থেকে বহরমপুরে ফিরে গেলেন।

বাড়িতে তখন তাঁর মা অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। কালিদাস নিজে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মা হয়ত আর বেশী দিন বাঁচবেন না। মায়ের ইচ্ছে আর বাবার নির্দেশে তিনি বিবাহ করতে রাজি হলেন। বিবাহ হল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। ডালটনগঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ভূপেনচন্দ্র মল্লিকের কন্যা সুকৃতি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল। তাঁর বিবাহকে কেন্দ্র করে সামাজিক উপদ্রব হয়েছিল। সেকেলে বিলাত ফেরতদের নিয়ে সমাজে দলাদলি ছিল। তাঁর শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা কেউ কেউ বিলেত ফেরত ছিলেন। এতে তাঁর আত্মীয়রা যোগদান করেননি। তাঁর পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। বাড়ীতে মা দুরারোগ্য রোগে শয্যাগত, বাবার চোখে জল, আত্মীয়-স্বজন তাঁকে বর্জন করেছেন - এরকম অবস্থায় ব্যথিত মনে তিনি বিবাহ করতে যান। অবশ্য তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা, ইনস্টিটিউটের বন্ধুরা এবং কলেজের বন্ধুরা তাঁকে ত্যাগ করেননি। গ্রামের সুজাতি কুটুম্বেরাও বৌভাত বর্জন করেছিলেন। নিজের বিয়েতে তিনি নিজে ব্রজবুলিতে একটি কবিতা লিখেছিলেন।[২৬]

বাড়ি ফিরে দেখলেন মার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। বৌভাতের আয়োজন সুজাতিরা পণ্ড করেছিলেন। পরদিন রাতেই নববধূকে আশীর্বাদ করেই চির বিদায় করলেন। যে সব আত্মীয়রা বিবাহ উপলক্ষে এসেছিলেন তাঁরা মায়ের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে ফিরে গেলেন। কালিদাস বধূবরণ করেছিলেন একটি কবিতা লিখে :

হলো তোমার বরণ প্রিয়ে মরণ নদীর ধারে
বোধন হলো রোদন ভরা বীণার ঝনৎকারে।[২৭]

আষাঢ় মাসে তিনি কলকাতা ফিরে গেলেন। তখন কবিতা লেখা হচ্ছে কিন্তু শরীর আবার খারাপ হলো পূজার ছুটির পর কলকাতায় ফিরে এসে আদাজল খেয়ে পড়ায় মন দিলেন কিন্তু শীতের প্রারম্ভে আবার চোখ মুখ জ্বালা করে, জ্বর, তার সঙ্গে নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকল। এই অবস্থায় পড়াশুনায় মন বসাতে পারলেন না, বহরমপুরে ফিরে গেলেন।

কলকাতায় গেলে সব উপসর্গ বাড়ে, কলকাতার বাইরে গেলে ভালো থাকেন। সাহিত্য তখন মাথায় উঠেছে। পরীক্ষা দেবেন না ঠিক করেছেন। বিবাহের পর "দায়িত্ব পীড়া দিচ্ছে" এরকম সময় মহারাজের বাহার বন্দর স্টেটের ম্যানেজার হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তাঁর সহযোগিতায় তিনি উলিপুর স্কুলে পঁচাত্তর টাকা বেতনে Assistant Headmaster পদে যোগদান করলেন। কলকাতার কাছ থেকে তিনি বিদায় নিয়ে গেলেন। বিদায় নেবার সময় মনে খুব ব্যথা পেলেন। ইনস্টিটিউট হল থেকে চোখের জল মুছতে মুছতে বের হয়ে এলেন। মনে হল সাহিত্যের সঙ্গে যেন তার চির বিচ্ছেদ হল।

৬.

কবিশেখর সারা জীবনই শিক্ষকতা করে কাটিয়েছেন। প্রথম শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে গেলেন উলিপুরে, উত্তরবঙ্গের সেটা ১৯১৩ সাল। উলিপুরে বাংলাদেশের এক প্রাচীনতম স্কুল মহারাণী স্বর্ণময়ী হাইস্কুলে তিনি প্রথম শিক্ষকতার কাজ শুরু করলেন। তখন উলিপুর যেতে হলে স্টীমারে পদ্মাপার হয়ে যেতে হত তিস্তা জংশনে। সেখান থেকে তিনি প্রথমে যান কুড়িগ্রামে। কুড়িগ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার ইন্দুভূষণ রায় তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। কুড়িগ্রাম থেকে হাতির পিঠে চড়ে তিনি উলিপুরে পৌছান।

উলিপুর গ্রামখানি আধাপল্লী আধাশহর। কাশিমবাজারে মহারাজের কাছারি বাড়ির জন্যই এর কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। উলিপুরে প্রকৃতিক পরিবেশটিও বেশ মনোরোম ছিল। স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। সারাদিন স্কুলে কাজ করে বিকেলে ছেলেদের সঙ্গে ব্যাটমিনটন খেলে তাঁর সময় কাটত। সন্ধ্যাবেলায় তিনি নিয়মিত কাব্যচর্চা করতেন। তিনি ১৯২০ সাল পর্যন্ত উলিপুরে ছিলেন। এখানে থাকবার সময় নিয়মিত তাঁর কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল। প্রথম তিন বছর এখানে তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক থাকার পর এক বছর অস্থায়ী প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করেন। পরে তিন বছর তিনি প্রধান

116357
29 APR 1997
NORTH BENGAL University Library Raja R... ...

শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এখানে থাকতে থাকতে ১৯১৪ সালে লাকুটিয়ার জমিদার দেবকুমার রায়চৌধুরীর অর্থ সাহায্যে 'পর্ণপুট'(১ম খন্ড) কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কাব্যরচনার পিছনে উলিপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তিনি উলিপুরে থাকবার সময় প্রথম মফঃসলের স্কুল শিক্ষক হিসেবে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এর আগে কোন শিক্ষক এই সম্মান পাননি।

উলিপুরে তিনি মোটের উপর ভালই ছিলেন। রংপুরের জেলাশাসক তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাছাড়া আরো অনেকের স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন। এই খানে থাকবার সময় তাঁর 'ব্রজরেণু' এবং 'ঋতুমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রংপুর শাখা তাঁকে 'কবিশেখর' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেছিল।

তবু উলিপুরে তাঁর থাকা হল না। সাত বছরের উত্তরবঙ্গে বাসের পাট তুলে তিনি চলে এলেন। তিনি এম.এ. পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এক বছরের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কলকাতায় এসে আর ফিরে যাওয়া হল না। এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ দীনেশ চন্দ্র সেনের সাহায্যে বড়িষা হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হলেন। উলিপুরে তাঁর আর যাওয়া হল না। তিনি একটি কবিতায় এই উলিপুরের স্মৃতি মনে করে লিখেছিলেন' 'আপনার গৃহ হতেও স্পৃহনীয় আমার তুমি।" [২৮]

১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের শেষ পর্যন্ত তিনি বড়িষা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এ সময় তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ সময়ের মধ্যে তিনি সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নবীন এবং প্রবীন সাহিত্যিকারদের সঙ্গে তার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি 'বসুধারা' নামক মাসিক পত্রিকারও প্রবর্তন করেছেন।

বড়িষা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করবার সময় ১৯২৮ সালে একবার তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদের প্রার্থী হয়েছিলেন কিন্তু ঐ পদে মোহিতলাল নির্বাচিত হলেন। কালিদাস রায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্য ঐ পদে যোগ দিতে নিষেধ করেছিলেন।[২৯] কেননা তাঁর মনে হয়েছিল পদটি কালিদাস রায়ের উপযুক্ত নয়। কালিদাস রায় নিজেই লিখেছেন, মোহিতবাবু পাওয়াতে তিনি সত্যিই খুশী হয়েছিলেন।

> আমি ত আমি তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি তখন কেউই ছিল না। সেটা অন্যে জানত না আমি জানতাম। আর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কর্তা সুশীল বাবু জানতেন। অসামান্য কিছু ছিল না, ছিল infinite protentiality সে খবর সকলে কি করে জানবে।[৩০]

তিনি মোহিতলালকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানালেন। ১৯২৯ সালে আর একবার সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ সুশীল কুমার দে বাংলা বিভাগের যোগ দেবার ব্যাপারে কালিদাসের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেবারেও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মভার গ্রহণ করতে পারেননি। তবে পরীক্ষক হিসাবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বরাবরই যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নানা দায়িত্বও পালন করে এসেছেন।

১৯৩১ সালের আরম্ভে শ্যামাপ্রসাদের আহ্বানে তিনি ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে যোগ দিলেন। এই স্কুলেই তিনি ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। এখানে দীর্ঘ ২২ বৎসর শিক্ষকতা করে ৬৪ বৎসর বয়সে রিক্ত হস্তে[৩১] অবসর গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর জীবনের কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। ১৯৩৪ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এক সন্তানের মৃত্যু হয় এবং কয়েকজন বন্ধুর অকাল মৃত্যু ঘটে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'হৈমন্তী' 'ত্রৈকালী'

প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কলকাতার দক্ষিণে নিজের বাড়ি 'সন্ধ্যারুলায়' নির্মাণ করে সেখানে উঠে এসেছেন। তাঁর একাধিক সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ কাজেও নিযুক্ত হয়েছেন।

৭.

বাল্যকাল থেকেই কালিদাসের কবিতার রচনাশক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। গ্রামের পাঠশালায় বন্ধুদের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি বন্দোমাতা সুরধুনী কবিতা উচ্চারণ করতেন। এর মধ্যেই তিনি কাব্যের প্রথম স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। গ্রামের মাইনর স্কুলে যখন পড়েন লীলাময়ী প্রকৃতির কাছে তিনি কবিতা রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর এক আত্মীয় গোকুলানন্দ সেন যাত্রার পালা এবং গান লিখতেন। তাঁকে দেখে কালিদাসের কবিতা রচনার ইচ্ছা হয়। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন : " তাঁর লেখা দেখে আমারও পদ্য লিখবার বাতিক জন্মে।" [৩২] এই সময় কবি হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি একটি শোকোচ্ছ্বাস মূলক কবিতা লিখেছিলেন। 'হিতবাদী'তে সে কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ছাপার অক্ষরে সেই তার প্রথম কবিতার প্রকাশ।[৩৩] পরে ১৩১৩ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর 'মেঘ ও ময়ূর' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই তাঁর কবিতা রচনার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন ছিল। এই মাইনর স্কুলে পড়বার সময় তিনি মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের অনেক কবিতা পড়েছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারতের অনেক অংশও তাঁর পড়া হয়েছিল। এরকম সময় একদিন রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার একটি পাতা তিনি কুড়িয়ে পান। এই কবিতার ছন্দ ও সুর তাঁকে আকৃষ্ট করে। ইতিপূর্বে 'যোগী' কবিতার 'পশ্চিমে ডুবিছে ইন্দু সম্মুখে উদার সিন্ধু' ছত্রটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এরপর গ্রাম জীবনের পালা শেষ করে তিনি শহরে কাশিমবাজারে চলে আসেন। কাশিমবাজারে স্কুলে পড়বার সময় তাঁকে প্রায় নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবন যাপন করতে হত। তখন এই নির্বান্ধব জীবনের বেদনা তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করে। কাশিমবাজারের দুই রাজবাড়ী বৃত্তবান মানুষদের আনাগোনা, সেগাই সাংগ্রী

প্রহরীর উপদ্রব, ধনি-সন্তানদের অবজ্ঞা, এসবই এই অনুভূতিশীল কিশোরের মনটিকে অত্যন্ত পীড়িত করত। আত্ম প্রতিষ্ঠার কামনা তাঁর মনে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠত। অথচ এই বস্তু-ভারাক্রান্ত জগতের লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ যেন ছিল তাঁর সাধ্যের বাইরে। তিনি লিখছেন :

> লক্ষ্মীর ভোরণে যেরূপ সাশ্ত্রী প্রহরীর উপদ্রব - সেখানে ত আমার প্রবেশের অধিকার নাই। মা সরস্বতীর পদ্মবনে তো কোন প্রহরী নাই, সেখানে কি কখনো আশ্রয় মিলিবে না।[৩৪]

এই অবজ্ঞাত দৈন্য সংকুচিত নির্বান্ধব কিশোরটির মনে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা প্রতিদিনকার ব্যক্তিগত হাত থেকে বাইরে গিয়ে নিজের অনুভূতিশীল মনের অনুরূপ একটি রাজ্য আবিষ্কার করবার আর্তি তাঁর এই বয়সের মানসিকতায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ক্রীড়া সঙ্গীর অভাবে তিনি একদিকে সময় কাটানোর জন্য বাধ্য হয়ে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়ছিলেন আর অন্য দিকে প্রকৃতির সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেছিলেন। তিনি লিখছেন :

> দীর্ঘ অবকাশগুলি কিসে কাটে ? এরূপক্ষেত্রে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য।[৩৫]

আর তাই করলেন তিনি। ছায়াচ্ছন্ন বনপথ গোরস্থানের মর্মর মণ্ডিত সমাধির উপর দাঁড়িয়ে বা বসে গঙ্গার স্রোতধারার গতিশীলতার সঙ্গে তাঁর গতিশীল কল্পনা আকাশচারী হয়ে উঠত। বসন্তের কাশিমবাজারের পুষ্প বর্ণশোভা তাঁর কিশোর মনকে মাধুর্যে এবং অকারণ পুলকে রোমাঞ্চিত করে তুলত। শত শত কাকলিতে যেন বন ভূমিতে মহোৎসব লেগে যেত। এ সবই কবি অনুভূতিশীল মন নিয়ে শোষণ করে নিচ্ছিলেন। এই বসন্তের পুষ্প সমারোহ আম্র-মুকুলের চূর্ণ চূর্ণ রেণু বর্ষণ, পাখির কাকলি, বনশ্রীর অপূর্ব রূপ মাধুর্য, এ সবই তাঁর মনে একে একে সঞ্চিত হচ্ছিল। সবই তার কবিতার ইন্ধন হচ্ছিল ক্রমশ, এর সঙ্গে পড়াও চলছিল নিয়মিত। তিনি একস্থানে লিখছেন - টোলে কালিদাসের কাব্য পড়তে গিয়ে তাঁর মনে সৃজন শক্তির বীজ উপ্ত হয়েছিল।[৩৬] আর তারই সঙ্গে কবির ইংরেজি কাব্যপাঠ চলছিল পুরোদমে। স্কুলে পড়বার সময়ই কবিতার খাতা ভরে উঠেছিল। কলেজে পড়তে গিয়ে

তিনি হুইলার সাহেবের কাছে কবিতার আসল মর্ম বুঝলেন। শেলী, টেনিশন, কীটসের কবিতা পড়ে তিনি বুঝতে পারলেন কবিতা বস্তু ঠিক কি রকম। এই সময় বন্ধু সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে অনেক রবীন্দ্রকাব্য পড়েছিলেন। যে টোলে তিনি সংস্কৃত পড়তেন সেই পণ্ডিত মশাইকে তিনি প্রথম রবীন্দ্রকাব্যের স্বাদ চিনিয়ে ছিলেন। টোলের দুটি বছর সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্য পাঠও চলেছিল নিয়মিত। তাঁর এই সময়টিকে বলেছেন 'বাসন্তী পূর্ণিমার মতো।'[৩৭] তাঁর প্রথম কবিতার বই 'কুন্দ' বের হয় ১৯০৮ সালে। তখন তিনি কলেজে ভর্তি হয়েছেন। এই পর্বে তাঁর প্রথম জীবনে কবিতা লেখার উৎসাহ এসেছিল তাঁর পিসতুতো দাদা রাধিকাচরণ বরাটের কাছ থেকে। যদিও তিনি তাঁকে খুবই মন দিয়ে পড়াশুনারও পরামর্শ দিতেন।

'কুন্দ' বেরিয়েছিল কলকাতা থেকে। তাঁর এক আত্মীয় বনোয়ারীলাল বরাটের কলকাতায় গুপ্ত প্রেসে কাজ করতেন। তিনি এই বই ছাপিয়ে ছিলেন। 'কুন্দ' উৎসর্গ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নামে, আর এই বই ছাপিয়ে তিনি নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, স্যার গুরুদাস, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশ সমাজপতি, অশ্বিনীকুমার দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ সেন - প্রমুখের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁরা অনেকেই কুন্দের কবিকে আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন।

অক্ষয় সরকার লিখেছিলেন : "বাবা আমি তোমায় চোখে দেখি নাই, তোমার কবিতা পড়িয়াই ভালবাসিয়াছি।" [৩৮] রবীন্দ্রনাথও কুন্দের কবিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৩১৫ সালের শেষ দিকে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে সাহিত্য সম্মেলন হল। কালিদাস স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিলেন। এখানেই তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্মুখে তাঁর অন্তরের যে শ্রদ্ধা তা আরো ঘনীভূত হল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি ছবি তুলতে পারেননি। সেজন্যে তাঁর দুঃখ থেকেই গিয়েছিল। কিন্তু কবির কাছ থেকে তিনি উৎসাহ পেয়েছিলেন। কবি তাঁকে ইংরেজি কবিতা অনুবাদ করে হাত পাকাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলন

উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আরো অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সৈদাবাদে তখন 'কনিকা' এবং 'উপাসনা' নামে দুটি কাগজ বের হয়েছিল। এই সব কাগজেও তাঁর লেখা কিছু কিছু বের হতে থাকে।

কাশিমবাজারে থাকতেই তাঁর বৈষ্ণবীয় কবিতা রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। কাশিমবাজারে মহারাজার পৃষ্টপোষকতায় সে সময় বৈষ্ণব সংস্কৃতির কিছুটা ছড়িয়েছিল। তিনি নিজে ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব কবির বংশের সন্তান। আবাল্য বৈষ্ণবীয় কীর্তনের রসে লালিত। ছোট বেলায় শোনা কীর্তন গান অনেক তাঁর মুখস্থ ছিল। কাশিমবাজারে পণ্ডিত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থের প্রভাব তখন যথেষ্ট ছিল। তিনি বৈষ্ণব মাসিক পত্র গৌরাঙ্গ সেবকের সম্পাদক ছিলেন। বৈষ্ণব তত্ত্বে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর কাছে অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত যাতায়াত করতেন। সৈদাবাদে থাকবার সময় এঁর কাছে তিনি 'শ্রীগোপাল চম্পূ' ও 'অলংকার কৌস্তুভ' পড়েছিলেন। স্মৃতিকথায় তিনি জানিয়েছেন এঁর প্রভাবেই তিনি ব্রজলীলাপদ রচনা শুরু করেন।[৩৯] অন্যত্র আবার দেখতে পাই তিনি জানাচ্ছেন, খৃষ্টান অধ্যাপকের ছাত্র ছিলেন তিনি। পাছে তাঁকে খৃষ্টান বলে কেউ ভাবে সেজন্যই এই বৈষ্ণবীয় কবিতা রচনার দিকে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন।[৪০] প্রসঙ্গত মনে করি তিনি কাশিম বাজারে থাকবার সময় একদিকে যেমন তাঁর প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর শোভার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে যেমন তার অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়েছিল, তেমনি হয়েছিল সেখানকার অতীত আবেষ্টনী। কবির কৈশোরে কাশিমবাজার অতীত গৌরবের শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'একটি জাতির অদৃষ্ট সূর্যের অস্তাচলের জীর্ন সূচনা'[৪১] এই কাশিমবাজারে অতীত গৌরবের শ্মশান ভূমিতে দাঁড়িয়ে কত চিন্তাই না তাঁর মনে উদিত হত। বিদেশী বণিকদের গোরস্থান, স্বদেশী বণিকদের কুটিরের ভগ্নাবশেষ, হিন্দু, জৈন, মুসলমান ও আর্মানি খৃষ্টানদের জীর্ণ ভজনালয় সবই তাঁর কৈশোর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধিত

করত। এখান থেকেই তাঁর অতীত চারণার সূচনা। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারা যায় - সেকালে রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজে অতীতের মুখ স্মৃতিচারণা করেছেন তাঁদের বহু কবিতায়। এই অতীত বিলাস তাঁদের রচনায় একটি অপরূপ মাদকতা সৃষ্টি করত। এটি যেন সেকালে এক রকম কাব্য প্রকরণে পরিণত হয়েছিল।

১৯১১ সালে তিনি কলকাতায় এলেন। এই কলকাতার ছাত্র জীবনেই তাঁর সাহিত্য রচনার উন্মেষ ঘটে। তখন হুইলার সাহেবের শিক্ষায় তাঁর কবিতার আদল কিছুটা উন্নত হয়েছে। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় তিনি 'কিশলয়' নামে একটি কবিতার বই ছাপেন। এই বই-এর ভূমিকা লিখেছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। এর পরে তিনি 'বল্লরী' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর মধ্যে 'কুন্দ' এবং 'কিশলয়' কাব্যের কবিতাও ছিল। কলকাতায় থাকবার সময় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রমথ চৌধুরী, কবি করুনানিধান প্রমুখ রবীন্দ্রানুসারি কবিবর্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। 'মানসী' পত্রিকাকে অবলম্বন করে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, ইনি তারও সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় সেখানে তিনি শব্দাড়ম্বরপূর্ণ একটি প্রশস্তি পাঠ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সময় তাঁর একটু কাব্যালোচনাও হয়েছিল। তিনি কবিকে কৃষক কৃষাণীর ব্যথা আর বিরহের হাহুতাশের কবিতা বাদ দিয়ে পৌরানিক বিষয়ের নূতন তাৎপর্য আরোপ করে কবিতা লিখতে বলেছিলেন। তিনি অবশ্য একটি কথা কবিকে জানিয়েছিলেন, আপনার নিজস্ব পথটি এখনও খুঁজে পাননি।[৪২] মোহিতলাল মজুমদারকে সত্যেন্দ্রনাথের কথাটা তিনি জানিয়েছিলেন। মোহিতলাল বলেছিলেন ফুলের ব্যথা, তারার ব্যথা বা নদীর ব্যথার চেয়ে কৃষক কৃষাণীর ব্যথা ঢের বেশী বাস্তব। এই বাস্তবতাই শ্রেষ্ঠ কবিতার উপজীব্য। কালিদাস এই পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের পথ বর্জন করেছিলেন।

রজনীকান্ত সেনকে তিনি 'কুন্দ' পাঠিয়েছিলেন। তারপর ১৯১১ সালে তাঁর কবিতার উপরে প্রবন্ধ লিখে বঙ্গীয় পরিষদ থেকে পদক লাভ করেছিলেন। রাজশাহী সাহিত্য সম্মেলনে রজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ফিরে এসে তিনি কবিতা লিখে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিলেন। রজনীকান্ত তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন :

কণ্ঠায় গীতের কুন্দে মেলিল যা চোখ
শরতের শতদলে পূর্ণ তাহা হোক।[৪৩]

কলকাতায় এম.এ পরীক্ষা না দিয়েই তিনি শিক্ষকতার চাকরী নিয়ে চলে গেলেন উলিপুরে। তত-দিনে প্রবাসী, ভারতী, উপাসনা, মানসী প্রভৃতি কাগজে তাঁর লেখা বেরিয়েছে। উলিপুরে তাঁর অবসর ছিল যথেষ্ট। কিন্তু যথার্থ সাহিত্য উপভোক্তা গোষ্ঠী কিছু ছিল না। কলকাতা ছেড়ে আসবার সময় তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর সাহিত্য জীবনের যেন অপমৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু এই উলিপুরে থাকতেই তাঁর রচনার অজস্রতা দেখা দেয়। স্ত্রী সুকৃতি দেবীকে সেখানে নিয়ে যান। উলিপুরে প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বন্দ্ব বিক্ষোভহীন জীবন এবং অফুরন্ত অবসর তাঁর রচনার স্রোতের সাহায্যকারী হয়েছিল। বৈষ্ণবীয় ধারায় কবিতা রচনা আগেই শুরু হয়েছিল, এখানে থাকতে তিনি বিখ্যাত বৃন্দাবন অন্ধকার কবিতাটি প্রকাশ করেন। কবিতাটি ১৯১০ সালে তিনি যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন লিখেছিলেন।[৪৪] কবিতাটি তিনি প্রবাসীতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে sectarian কবিতা বলে ছাপতে পারেননি। ভারতীও এটি ছাপেনি। 'ভারতী' তখন নব্যদলের মুখপত্র ছিল। মানসীর অন্যতম সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন বাগচীও কবিতাটিতে বস্তুর অভাব লক্ষ করে ফেরৎ পাঠিয়ে ছিলেন। পরে তিনি উলিপুরে থাকবার সময় 'ভারতবর্ষে' কবিতাটি ছাপা হয়। উলিপুরে থাকবার সময় তাঁর পর্ণপুট (১ম) প্রকাশিত হয়। এই বই লাকুটিয়ার জমিদার কবি দেবকুমার রায়চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে ছাপা হয়েছিল ১৯১৪ সালে। 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর তাঁর কবিখ্যাতি প্রচারিত হয়ে পড়ল। এই সময় তিনি ব্রজলীলা বিষয়ক আরো কতকগুলি কবিতা লেখেন।

সেগুলি নিয়ে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে 'ব্রজবেণু' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেটি ১৯১৫ সালের কথা। পরের বছর ১৯১৬ প্রকৃতি ও প্রেমমূলক কবিতার সংগ্রহ নিয়ে 'ঋতুমঙ্গল' প্রকাশিত হল। রঙ্গপুরে সাহিত্য সম্মেলন হল। কবির পর্ণপুট (১ম) ব্রজবেণু, বল্লরী- এবং ঋতুমঙ্গল কাব্য তখন সেখানে জনপ্রিয়। ঐ সম্মেলনে রঙ্গপুরের পক্ষ থেকে কালিদাস একটি আবাহনী কবিতা রচনা প্রকাশ করেন। উলিপুরের সন্নিকটে রাণী সত্যবতীর প্রতিষ্ঠিত ধামশ্রেণী নামে একটি দেব প্রতিষ্ঠান ছিল তার কাহিনী নিয়ে একটি কবিতা রচনা করলেন -

পাটের দেশে মাঠের মাঝে পুণ্য পীঠে শান্তি মঠ
ধূধূ করে রৌদ্র মাঝে হেথায় হেরি বিশ্ব মঠ।[৪৫] - ইত্যাদি

এই ধামশ্রেণী উত্তরবঙ্গবাসীর মনকে নাড়া দিল। তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পেল। কবির এতদিনকার এই কাব্য কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রংপুর শাখা তাঁকে 'কবিশেখর' উপাধি প্রদান করলেন। মহারাজের আদেশ অমান্য করে রংপুর জেলাশাসক তরুন শিক্ষক কালিদাসকে প্রধান শিক্ষক করতে কমিটিকে আদেশ দেন। কিছু সহকর্মীর প্ররোচনায় স্থানীয় কয়েকজন তাঁর নামে বেনামী চিঠি দেয়। তবু কমিটি কালিদাসকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নির্বাচন করলেন। কয়েকজন সহকর্মী তাঁর সঙ্গে বিরূপ আচরণ করতে থাকেন। তাছাড়া বেনামী চিঠির ভিত্তিতে ছাত্রদের জন্য বই ক্রয় নিয়ে মহারাজের সঙ্গে মতান্তর ঘটে। এ সমস্ত কারণে তিনি ১৯২০ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় এলে আর উলিপুরে ফিরে যান নি।

উলিপুরে থাকবার সময় তাঁর চারখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। উলিপুর ছেড়ে কলকাতা আসার পর তাঁর কাব্য জীবনের কিছু পরিবর্তন হল। কলকাতায় থাকতে একে একে তাঁর পর্ণপুট (২য়) দুদকুঁড়া, চিত্তচিতা প্রকাশিত হতে লাগল। ১৯২৩ সালে রসকদম্ব

প্রকাশিত হল বেতালভট্ট ছদ্মনামে ভারতবর্ষে প্রকাশিত গানগুলি নিয়ে। এটিকে কবিশেখরের কাব্য জীবনের দ্বিতীয় পর্ব বলা যায়। এই পর্বে তিনি কাব্য রচনায় যেমন পরিণত হয়েছেন, তেমনি সাহিত্য মূলক প্রবন্ধও অনেক লিখছেন। ১৯২৬ সাল থেকে তিনি বঙ্গবাসী, উপাসনা, মানসী, মর্মবানী ইত্যাদি পত্রিকায় বহু গ্রন্থের সমালোচনা লিখতে শুরু করেন এবং ছন্দ চিন্তায় মগ্ন হন। ১৯২৮ সালে তিনি রসচক্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'বসুধারা' অল্প কিছু দিন তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতায় এসে কিন্তু কবির কাব্য রচনা প্রবাহ যেন ক্ষীনধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। এসময় জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে বেশী মন দিতে হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক রচনায়। মৌলিক কাব্য এই পর্বে 'হৈমন্তী' (১৩৪১) এবং 'বৈকালী'(১৯৪০) প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর 'আহরণী' নামক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নামেই প্রকাশ যেন কবি জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন। এখন তাঁর গদ্য রচনাও কিছু কিছু পুস্তক আকারে প্রকাশিত হচ্ছে আর তার সঙ্গে বের হচ্ছে কিছু অনুবাদ গ্রন্থ। ১৯৩০ সালে তিনি 'গীতগোবিন্দ' ১৯৩২-এ 'গীতা লহরী' প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ সালে তিনি 'প্রাচীন গ্রন্থ' নামক সমালোচনা এবং ১৯৪৬ সালে 'কাব্যে শকুন্তলা' ১৯৪৯ সালে তাঁর বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়(১ম), ১৯৫০ এ একই ২য় খন্ড এবং প্রাচীন সাহিত্য নামক সমালোচনার ২য় খন্ড। নূতন কাব্য আর প্রকাশিত হচ্ছে না। ১৯৫০-এ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সংকলন গ্রন্থ আহরন। মোট কথা কবির মৌলিক রচনার পরিবর্তে পুরান রচনাগুলির নূতন সংকলন কিংবা সংস্কৃত কাব্যের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এই রকম একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হল, যার নাম 'সন্ধ্যামণি।' ১৯৬৪ সালে কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। প্রকাশিত হয়। এই সময় কবির মনে ধারণা জম্মেছিল মনের প্রসাদ না থাকলে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। স্বপ্নের দিন ফুরিয়ে যাওয়ায় তাঁর কবিতায় নৈরাশ্য আর ঔদাস্য উপজীব্য হবে। তাছাড়া পরপারের আহ্বানও কবিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কবিতা তরুণ তরুণীদের উপভোগ্য নয়। পত্র পত্রিকার সম্পাদকদের

অধিকাংশই তরুণ ও মধ্যবয়সী। তাদের পত্রিকায় এসব ছাপা হয় না।[৪৬] তবু যা লিখ-ছিলেন তা সাহিত্য সৃষ্টির আশায় নয়। কতকটা নেশা ও কতকটা পেশার তাগিদে। তা মন্দ হলেও একটা মানসিক সান্ত্বনা। তাই আশা উল্লাস স্বপ্নের পরিবর্তে কবির দীর্ঘ জীবনের স্মৃতিতে ভরা তাঁর শেষ পর্বের কাব্যগুলি।

বিবর্তন ও বৈচিত্র্যে ভরা কালিদাসের সাহিত্যজীবন। শুধু কাব্য নয়, অনুবাদ-সাহিত্য, কিশোর সাহিত্য এবং পদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন ধারাতেও তাঁর অবদান আছে। রস-রচনা এবং প্রবন্ধের পরিমান নিতান্ত কম নয়, বিশেষ ভাবে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনায় তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :

> পদ্যে পদ্যে এই সমশক্তি সম্পন্ন সব্যসাচিত্বেই তাঁহার অনন্য সাধারণতা।
> ... কবি কালিদাস তাঁহার জীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর পর্যন্ত প্রধানতঃ
> কাব্য রসেই বিভোর ও কবি আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। পঞ্চাশোর্ধে
> তাঁহার কবিমন কাব্যরস-বিশ্লেষনের বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছে।
> এ যেন কাব্য রচনার প্রত্যক্ষ রাজৈশ্বর্য ভোগ পরিত্যাগের পর তাঁহার
> পরোক্ষ রহস্য অনুধাবনের পালা কবি জীবনে আর্বিভূত হইয়াছে।[৪৭]

রসচক্র একটি সাহিত্যিক সংসদ। কলকাতার কালিকা প্রেসের মালিক মনোরঞ্জন চক্রবর্তী একটি মাসিক পত্রিকা বের করতে উদ্যোগী হন। কালিদাসের সম্পাদনায় এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে ১৩৩৫ সালের আশ্বিন মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হল। পত্রিকা-টির নাম 'বসুধারা'। অধ্যাপক বিশ্বজ্যোতি চৌধুরী এ বিষয়ে কালিদাসকে সাহায্য করে-ছিলেন। তাঁরা দুজনে পরিচিত সাহিত্যিক বর্গের কাছে লেখা সংগ্রহ করে প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত করেন। কয়েক মাস নিয়মিত প্রকাশের পর আর্থিক লোকসানের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।

বিজ্ঞাপনের টাকা ঠিক ভাবে আদায় হচ্ছিল না। শনিবারের চিঠির বিরূপ সমালোচনা পাঠকের মনকে প্রভাবিত করে। ফলে 'বসুধারা'র পাঠকের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসের সংখ্যাটি প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। কবিশেখরের এই প্রথম এবং শেষ মাসিক পত্রিকার সম্পাদকতা।[৪৮] 'বসুধারা' বন্ধ হলে লেখকদের নিয়ে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে তোলা হল। প্রতি রবিবার বৈকালে কালিদাসের বাড়িতে সাহিত্য সম্মেলন বসত। এই সাপ্তাহিক সাহিত্য সম্মেলনটির নাম দেওয়া হল - 'রসচক্র'।

যাঁদের নিয়ে রসচক্র নামক বন্ধু সম্মেলন গড়ে উঠল তাঁদের নাম - অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কথাশিল্পী নুট বিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (উকিল কবি), হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, জগদীশগুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত, গায়ক অতুলানন্দ বক্সী, নন্দ গোপাল সেন-গুপ্ত, প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়, পাক্ষিকপত্র সম্মিলনীর সম্পাদক কালীমোহন বসু, উদ্বোধনের লেখক ধর্মপ্রাণ কুমুদবন্ধু সেন, অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তি। এই বৈঠকে গল্পগুজব ও কিছু কিছু সাহিত্য আলোচনা চলত। রসচক্রের কোন কর্মসূচী ছিল না। সাহিত্য আলোচনার সাথে রঙ্গ-রসিকতা ও সিরিয়াস বিতর্ক চলত। কালিদাসের বাসা বদলের সাথে সাথে রসচক্রের আসরও বদলাতে বাধ্য হত। ফলে পরবর্তী কালে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরে যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে কথাশিল্পী গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথ ঘোষ, মনোজ বসু, কবি জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কবি জসিম-উদ্দিন, অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ঔপন্যাসিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী কবি সতীশ রায়, রবিবারের লাঠির সম্পাদক কেশব সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। স্বাভাবিক ভাবে রসচক্রের আসর খুবই জমে উঠল। প্রস্তাব হল ভ্রাম্যমান করে তোলা। একজন এক এক

রবিবারে রসচক্রকে আহ্বান করতেন। সাহিত্য সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে আলোচনা, কবিতা পাঠ, প্রবন্ধ পাঠ চললে কোন সমিতি বেশি দিন টেকে না। এই ভয়ে রসচক্র এসব যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলত। তবে রসচক্র আবৃত্তি, গান ও বিতর্ক এই তিনটিকে বাদ দেয় নি। নানা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি রসচক্রকে তাঁর বাড়ীতে আহ্বান করতেন। 'সম্মিলনী'তে রসচক্রের একটি অধিবেশনের রিপোর্টের শেষে জানানো হয়েছে - 'গত ৮ই মার্চ রবিবার দেশবন্ধুর জীবনী লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভবনে রসচক্রের বৈঠক বসে, ... আগামী রবিবার ১৫ই মার্চ বেলা ৫।। টায় ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোডে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের ভবনে রসচক্রের আগামী বৈঠক বসিবে।'[৪৯] কালিদাস রায় লিখছেন -

> আমাদের এই রসচক্র প্রতিষ্ঠানটাকে আমরা চেষ্টা করে গড়ি নি। এটি আপনা হতেই গড়ে উঠেছিল। কোন উদ্দেশ্য নিয়েও এর জন্ম নয়। প্রকৃতপক্ষে এ একটা বন্ধু সংসদ।'[৫০]

রসচক্রের অবারিত দ্বারে নবীন, প্রবীন, কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতজ্ঞ সকলেই আসতেন। কোন নির্দিষ্ট দলের প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবু তৎকালীন নিন্দুকের দল এই রসচক্রকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন - চরমচক্র, রসনাচক্র। রসচক্রের বার্ষিক সম্মেলনের ভার নিতেন কালিদাস রায় এবং তাঁর ভাই রাধেশ রায়। প্রথম সম্মেলন হয় বেলঘরিয়ায়। ১৩৩৮ সালের ৬ই ভাদ্র, সভাপতিত্ব করেন জলধর সেন। এই সভায় যতীন্দ্রমোহনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্রের প্রেরিত একখানি পত্র পাঠ করা হয়। রবীন্দ্রনাথও একটি কবিতা লিখে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন 'আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায় নবীন বটে ছিলাম কোন কালে ...' ইত্যাদি, ২রা ভাদ্র, ১৩৩৮। কাজী নজরুলও একখানি সরচিত গান গেয়েছিলেন। পত্র পত্রিকায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ফলে রসচক্র ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুঃসময়ে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে রসচক্রের মৃতপ্রায় দেহে নব জীবনের সঞ্চার হল। রসের বন্যা প্রবাহিত হল।

শরৎচন্দ্র জীবনের যে কোন স্মৃতি-বার্তা বা অভিজ্ঞতার কথা গল্পের টেক্‌নিকে বা কৌশলে প্রকাশ করতে পারতেন। শরৎচন্দ্র এই রসচক্রকে খুবই স্নেহ করতেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন বাগচী ঐ সময় একটি বার্ষিক পত্র সম্পাদনার সুযোগ পান। তিনি শরৎচন্দ্রকে লেখা চাইলে শরৎচন্দ্র তা দিতে সম্মত হন নি। এই নিয়ে মনোমালিন্য ঘটে। তার প্রভাব পড়ল রসচক্রের উপর। তবু যথা সময়ে শরৎচন্দ্র হাজির হতে ভুলতেন না। তাঁর মৃত্যুতে রসচক্র দুর্বল হয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর একটি অধিবেশনে কালিদাস প্রস্তাব রাখেন যে রবীন্দ্র জন্ম বৎসর হতে রবীন্দ্রাব্দ গণনা করা হোক্। এতে কেউ কেউ উপহাস করলেও 'প্রবাসী' 'আনন্দবাজার' পত্রিকা কবিকে সমর্থন করেছিলেন।[৫১] এই অধিবেশনই রসচক্রের শেষ অধিবেশন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ডঃ সুরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত সভাপতি হন। কালিদাসের পরে তাঁর ভাই রাধেশ রায় রসচক্রের সম্পাদক হন। ধীরে ধীরে রসচক্র উঠে গেলেও রসচক্রের সদস্যবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত 'রসচক্র' নামে বারোয়ারী উপন্যাসটি এর স্মৃতি বহন করছে।

৮.

কবি হিসেবে কালিদাস অনেক সম্মান লাভ করেছেন। ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর তাঁর কবি খ্যাতি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। উলিপুরে থাকবার সময় পর্যন্ত তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সাহিত্য পরিষদ তাঁকে কবিশেখর উপাধিতে ভূষিত করেন। কবির এই উপাধিটি তাঁর নামের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে কবিশেখর লিখছেন :

> রংপুরবাসীরা আমাকে তাদেরই একজন বলে ধরে নিয়েছিলেন। রংপুরে সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা ছিল। সেই শাখার একটি অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্নের সভাপতিত্বে, আই.সি.এস

ম্যাজিস্ট্রেট জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রস্তাবে আমাকে এই উপাধি দেওয়া হয়।[৫২]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লীলা লেকচার প্রদানের জন্য ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কবিকে আহ্বান জানায়। সেখানে ৩।৪।৫ ডিসেম্বর বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ব বিচার ও রস বিশ্লেষণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর ঐ বক্তৃতাগুলি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পদাবলী সাহিত্য' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে 'জগত্তারিনী পদক' প্রদান করে। সুনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জননীর নামানুসারে জগত্তারিনী পদকের প্রবর্তন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছরই একজন শ্রেষ্ঠ প্রবীন সাহিত্যিককে তাঁর সুদীর্ঘকালের সাহিত্যিক অবদানের জন্যে এই পদক উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া সম্মানের মধ্যে 'জগত্তারিনীপদক'কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে অভিহিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গুনীজন সম্বর্ধনায় কবিকে সম্বর্ধিত করে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান সদর রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক সমিতি, মহারাষ্ট্র নিবাস হলে 'অন্ধ্র সাহিত্য পরিষদ', দিল্লীর অনামিকা সাহিত্য সমিতি কবিকে সম্বর্ধনা জানায়। এছাড়াও নানান প্রান্ত হতে অনুরাগীদের কাছে সম্বর্ধিত হন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সাধারণ তন্ত্র দিবসে আকাশবাণী আয়োজিত সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন কালিদাস রায়। তিনি সেখানে স্বরচিত 'সুপ্রভাত' কবিতাটি পাঠ করেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রজন্ম শতবর্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে কালিদাস মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কবি নবীনচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতামালার আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানের প্রথম বক্তা হিসাবে কবিশেখরকে আহ্বান জানানো হয় (The University would be very pleased if you kindly agree to deliver the first memorial lecture on the 10th of February, 1963)[৫৩] ঐ বৎসর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সরোজিনী স্বর্ণপদক প্রদান

করেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা ঐ বৎসরেই 'আনন্দ পুরস্কার' প্রদান করেন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিশেখর যে ডি·এল·রায় লেকচার প্রদান করেন ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তা 'দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও গান' নামে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। কবির 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'রবীন্দ্রপুরস্কার' দান করেন। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি·লিট উপাধি প্রদান করেন ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কবিকে মরনোত্তর সম্মানসূচক ডি·লিট উপাধি প্রদান করেন।

১·

কবিশেখর কালিদাস রায় অতি সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। স্বভাব গম্ভীর হয়েও তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী সদালাপী এবং রসিক প্রকৃতির। তাঁর চেহারা ঠিক কবি জনোচিত ছিল না। তিনি ছিলেন শ্যামবর্ণ প্রশস্ত বক্ষ শক্ত সমর্থ চেহারার একজন মানুষ। প্রথম দর্শনে তাঁকে দেখে অনেকেরই মনের মধ্যে লালিত ধারণা ভেঙ্গে গিয়েছিল। সুকুমার সেন তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখছেন, 'ছোটবেলা থেকে তাঁর কবিতা পড়ে মনের মধ্যে একটা ছবি তিনি রচনা করে রেখেছিলেন কিন্তু চোখে দেখে তাঁকে কবি বলে ধরা কঠিন।[৫৪] শ্রীমতী বাণী রায় লিখছেন, শাল তরুর মতো দৃঢ় এবং একজন প্রকান্ড বক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি ছিলেন তিনি।[৫৫] অথচ এই মানুষটির অন্তরটি ছিল একেবারে শিশুর মতো সরল এবং সকলের জন্য প্রীতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ। প্রায়ই সকলেই তাঁর এই প্রাণময়তার পরিচয় তাঁদের স্মৃতিকথায় দিয়ে গেছেন। দীনেশ দাস লিখেছেন, প্রথম আলাপের দিন থেকেই তিনি তাঁকে একেবারে কাছের মানুষ করে নিয়েছিলেন।[৫৬] মনোজ বসু লিখেছেন, 'তাঁর স্নেহপ্রীতির তুলনা নেই।[৫৭] এই সব স্মৃতিচারণ থেকে বুঝতে পারা যায় তিনি অত বড় একজন কবি এবং খ্যাতনামা ব্যক্তি হয়েও কত মিষ্টভাষী সদালাপী এবং সহজ মানুষ ছিলেন।

কবিশেখরের পরিচয় শুধু কবি হিসাবে নয়, পন্ডিত হিসাবেও ছিল। অথচ তিনি কখনো তাঁর এই পান্ডিত্য জাহির করেন নি। অত্যন্ত ভাল সমালোচক ছিলেন তিনি। তাঁর বহু আলোচনা খুব উচুঁ মানের ছিল। কিন্তু তাঁর এই পান্ডিত্যের প্রকাশ কখনো তীব্র হয়ে কাউকে আহত করেননি। তাঁর নীতি ছিল বর্জন নয় সব কিছুকে গ্রহণ করা। আপাত গাম্ভীর্যের অন্তরালে তাঁর যে দরদী মনটি ছিল, সেই মন সমস্ত মানুষকে নিজের দিকে টেনে আনত। কত কবি সাহিত্যিক তাঁকে অকৃপণ ভাষায় প্রশংসা করেছেন। কুমুদরঞ্জন তাঁকে বলেছেন, অজাতশত্রু সবার বন্ধু সবার প্রিয়। প্রমথনাথ বিশী তাঁর চরিত্রের নিতান্ত ঘরোয়া রূপটি উদ্ঘাটন করেছেন একটি শ্রদ্ধার্ঘে। শিক্ষক হিসাবে তাঁর চরিত্রের স্নেহময় দরদী দিকটি সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটি লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। একদিকে যেমন ছাত্রের উন্নতি সাধনে তৎপর তেমনি তাঁর রচনা শক্তির স্ফুরণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সামনে থেকে দেখতে পান। কবিশেখর প্রায়ই সব সাহিত্যিকের লেখা যতটা সম্ভব পড়তেন। সমালোচনা যে করতেন না তা নয়, কিন্তু বলবার ধরণটা এমনই ছিল যে লোকেরা আঘাত পেত না। কেউ তাঁকে লেখা দেখাতে গেলে তিনি তাঁদের লেখা আগ্রহ ভরে দেখে দিতেন। বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্যের একটি স্মৃতি কথায় দেখতে পাই গ্রন্থকারেরাও তাঁকে অনেক সময় তাদের পান্ডু-লিপি দেখে দেবার জন্য দিতেন। তিনি তাঁর এত পরিশ্রমের ফাঁকেও গ্রন্থ সংশোধন করে উন্নত করে দিতেন। ছোট বড় নির্বিশেষে সমস্ত লেখকের সঙ্গে তিনি সমান ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন, 'সাহিত্যিকদের কোন বয়স নেই সকলেই সমবয়সী'।[৫৮] সাহিত্যিক মহলে সকলের তিনি ছিলেন দাদা। তাঁর কথা বলতে গিয়ে যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য লিখছেন :

তুমি দাদা, একেবারে আপন ভোলা গম্ভীর।
শিশুর মতো দিল দরিয়া ধার ধারো না গম্ভীর।
ভক্ত কবি প্রেমিক তুমি বেজায় খোলা অন্তর,
হিন্দু খাঁটি, ভন্ড নহ, নয়কো গতি মন্থর।[৫৯]

অনেক লেখকই তাঁর প্রীতিপূর্ণ সৌম্য এবং অকপট হাসির কথা জানিয়েছেন।

কবিশেখরের আন্তরিক এই সদ্ভাব এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের পাশাপাশি রঙ্গব্যঙ্গ প্রিয়তাও ছিল। তাঁর আপাত গাম্ভীর্যের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে এই হাস্যরসিক মজলিসী মানসটির প্রকাশ ঘটত। যারা তাঁকে রসচক্রের কেন্দ্রস্থলে দেখেছেন কিংবা খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন তারাই জানেন এই মানুষটি রঙ্গব্যঙ্গ সৃষ্টিতে কত সুচ্ছন্দ এবং সহজ ছিলেন। অথচ সকলেই বলেছেন, এই রঙ্গ রসিকতা কাউকেই আহত করেনি। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, অমায়িক, সাহিত্যপ্রাণ, পরহিতব্রতী এই মানুষটির রসবোধ তুলনা রহিত। একবার হরিনারায়ণ বাবু এবং কালিদাস রায় একটি সাহিত্য সভায় গিয়েছিলেন। সেখানে দেখলেন এক আধুনিক লেখকের দাপটে সকলেই অস্থির। কবি এই লোকটির পরিচয় নিলেন। তারপর একটি চিরকুটে লিখলেন :

বোকায় ভরা খোকায় ভরা দেশটা
নয়ক তাদের ভুলানো খুব শক্ত,
লেখায় আঁকায় যে করে তার চেষ্টা
সে পায় বহু টাকা এবং ভক্ত।[৬০]

লেখাটির মধ্যে কবি আমাদের বোকামী আর খোকামী নিয়ে যে রসিকতা করেছেন তা তাঁর রঙ্গব্যঙ্গের একটি নিদর্শন।

কবিশেখর ছিলেন আবাল্য গ্রামেই লালিত। গ্রামের জীবনকে ছেড়ে তিনি শহরে এসেছিলেন। গ্রামের জীবনকে তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। পল্লীর মানুষদের প্রতি তাঁর একটি আন্তরিক প্রীতি চিত্ততলে সদা সর্বদাই বহমান ছিল। এই মানুষটির মধ্যে আবার একটু আভিজাত্য এবং ভব্যতা বোধও ছিল। কারোর কাছ থেকে নিজের জন্য কিছু চাওয়া তাঁর স্বভাবের বাইরে ছিল। এই এতবড় মানুষটি কিন্তু মনে মনে ছিলেন অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির। তাঁর জামাতার অকাল মৃত্যুর কথা সব সময় তাঁকে পীড়া দিত। তিনি অনেক বয়সে স্মৃতিকথা বলতে গিয়েও তাঁর জন্য অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। পরিবারের সকলের জন্য

তাঁর মমতার অন্ত ছিল না। স্ত্রীর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ছিল। কালিদাস রায়ের কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর কবিতা ছিল বাংলাদেশের মাটির মত সরস এবং কোমল। কবিশেখরের মনটিও এই সরসতায় এবং কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল।

১০.

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি শিক্ষকতা কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ততদিনে তিনি বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। বাংলার প্রায় সমস্ত মাসিক পত্রিকায় তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় টালিগঞ্জে 'সন্ধ্যার কূলায়' নামে নিজ গৃহ নির্মান করেছেন। সেখানে নবীন, প্রবীন সকল লেখকের সমাবেশ ঘটত। কবিশেখর শেষ জীবনে বাঙালী সকল লেখকের 'দাদা' রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ জীবনলাভের ফলে তাঁর খ্যাতি ও সম্মান লাভ যেমন হয়েছে তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে শোক এবং বিপর্যয়ও ঘটেছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাসের বিবাহের অনতিপরে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটেছে। দীর্ঘজীবী পিতার মৃত্যু হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। জামাতা জগৎমোহন সেনও অকালে দেহত্যাগ করেন। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গিনী ও সহধর্মিনী সুকৃতি দেবীর মৃত্যু কবিকে বিহ্বল করে তোলে।

কবিশেখরের শেষ জীবনে বাংলা সাহিত্যের ঋতুবদল ও রুচি বদলের ফলে তাঁর কবিতার সমাদরও কিছুটা কমে যায়। সেজন্য এই সময় তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কবিতা লিখেছেন কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশে বাধা এসেছে। কবির রচনার উপর আঘাত হানলে তিনি আঘাত পেতেন না, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কেউ আঘাত হানলে আহত হতেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি আঘাত পেয়ে ছিলেন, তাঁর স্মৃতি কথায় স্বীকারোক্তি তার প্রমান -

> যে অবজ্ঞা সারা জীবন লাভ করে এসেছি তা শুধু স্কুলমাষ্টার বলে। অন্য কোন বৃত্তির লোক এত অবজ্ঞাত হয় না। যে সব সাহিত্যিকরা কোন চাকরী করেন না, অন্ততঃ ইস্কুল মাষ্টারী করেন না - তাদের অভিজ্ঞতা এরূপ তিক্ত নয়।[৬১]

আজীবন ইস্কুল মাষ্টারী করার জন্য কালিদাসের মনে একটা দুঃখবোধ থেকে গিয়েছিল। পাঠক সমাজেরও রুচি বদলে গিয়েছিল। তাঁর প্রাচীনপন্থী রচনায় তারা আনন্দ পাচ্ছিল না। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সন্ধ্যামণি' কাব্যগ্রন্থে 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ তিনি লিখেছেন -

> পঞ্চাশ বৎসর আগে 'কুন্দে' যে খেয়ালের সূত্রপাত হইয়াছিল সন্ধ্যামণিতে বোধ হয় তার শেষ হল। ফুলে সুরু, ফুলেই সারা, ভাবিওনি ফলের কথা। একতারা বাজাতে বাজাতে এতদূর এগিয়ে এসেছি। যুগযাত্রার পথে নয়, জীবনের যাত্রার পথে। যেরূপ দ্রুত গতিতে যুগের পরিবর্তন হয়েছে - তাতে যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সম্ভব কবির পক্ষে সম্ভব নয়। একতারাও এ যুগে অচল। ... আজকালকার সমালোচকেরা কবির কাব্যে একটা মতবাদ খোঁজেন। আমি কোন মতবাদের চারিপাশে ঘুরপাক খাইনি - তাত্ত্বিকতা আমার লক্ষ্য নয়, সাত্ত্বিকতাই আমার লক্ষ্য।[৬২]

এর পর আরো সতেরো বছর কবি বেঁচে ছিলেন। নূতন কবিতাও লিখেছেন, নূতন কাব্য-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কবির মনের ক্ষোভ, বেদনা দূর হয়নি। "একদিকে মনে হয়েছে 'খ্যাতি-যশে মোর আর নাই কোন লোভ, অপযশে আর হয়না আমার ক্ষোভ।' অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের 'গানভঙ্গ' কবিতার অনুষঙ্গে বলে ওঠেন - 'ভরে গেছে দেশ কাশীনাথে কাশীনাথে- বীণা কাঁদে নিঃসঙ্গ অপটু বরজলালের হাতে।"[৬৩] আজ কবি 'নিঃসঙ্গ অপটু'। দেহে জরা স্পর্শ করেছে। কবিশেখর সারাজীবনই নানা রকম রোগে

ভুগছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন তিনি। তার উপরে একের পর এক শোকে দুঃখে তাঁর শরীর এবং মন ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর পিতার মৃত্যু বেশ সুবৃদ্ধ অবস্থায় হলেও তিনি তাঁর কন্যার বৈধব্যে অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিলেন। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তার স্বামী মারা যান। তিনি কন্যাকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। যে সংসারে বালিকা কন্যা অল্প বয়সে বিধবা হয়ে আশ্রয় নেয় সে সংসারে শোকছায়া কখনো অপসারিত হয়না। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর গুণবান জামাতার অকাল মৃত্যুর কথা স্মরণ করেও অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

কবিশেখর তাঁর ছোট ভাই রাধেশচন্দ্রের মৃত্যুতেও অত্যন্ত শোকাহত হয়েছিলেন। রাধেশচন্দ্র ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

কবির স্ত্রীর মৃত্যুশোকও তাঁকে খুব বেজেছিল। তাতে তিনি ভিতরে ভিতরে ভেঙে গেছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কার প্রসঙ্গে তিনি স্ত্রী বিয়োগের কথা ভুলে থাকতে পারেননি। তিনি দিনেশ দাসকে বলেছিলেন 'দিনেশ দ্যাখো আজ উনি থাকলে কত আনন্দ পেতেন'। তার শরীরও খুব ভেঙে গিয়েছিলো। একটি চোখের ছানি কাটা হলেও কোন ফল হয়নি। অন্য চোখেও বিশেষ দেখতে পাননা। লেখাপড়া করতে পারেন না। উঠলে মাথা ঘোরে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীন হয়ে আসায় চোখে অস্ত্রোপচার করালেন। কিন্তু চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসায় কবি শেষ জীবনে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারালেন। তবু শেষ কয়েক বৎসর মুখে মুখে বলে কবিতা রচনা করেন। অবশেষে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর, ১৩৮২ বঙ্গাব্দে ৭ই কার্তিক শনিবার রাত্রি ১০-৪০ মিনিটে কবিশেখর তাঁর 'সন্ধ্যার কুলায়' পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে কবির বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৭ বৎসর। পরদিন বিভিন্ন পত্রিকায় কবির মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়। অনুরাগীরা

শোকবার্তা প্রেরণ করেন। নানা স্থানে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত হল -

"কবিশেখর কালিদাস রায় শনিবার রাত ১০-৪০ মিনিটে তাঁর টালিগঞ্জের বাসভবন - ১৩ চারু অ্যাভিনুর 'সন্ধ্যার কুলায়ে' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭। গত কয়েক বছর ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনি চারপুত্র, তিন কন্যা এবং অসংখ্য অনুরাগী পাঠক এবং আত্মীয়স্বজন রেখে গিয়েছেন।
... তাঁর পরলোক গমনে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হল।"৬৪

**********0**********

কবিশেখর কালিদাস রায়ের গ্রন্থ বিবরণী ॥

প্রকাশিত রচনাপঞ্জী

কাব্য :

১। কুন্দ (১৩১৫)
২। কিশলয়(১৯১১)
৩। বল্লরী (১৩২২)
৪। পর্ণপুট(১ম)(১৩২১)
৫। ব্রজবেণু(১৩২২)
৬। ঋতুমঙ্গল(১৯১৬)
৭। পর্ণপুট(২য়)(১৯২১)
৮। ফুলকুঁড়া(১৩২৯)
৯। রসকদম্ব(১৯২৩)
১০। লাজাঞ্জলি (১৩৩১)
১১। চিত্তচিতা(১৩৩৪)
১২। আহরণী(১৯৩০)
১৩। হৈমন্তী (১৩৪২)
১৪। বৈকালী (১৯৪০)
১৫। আহরণ(১৩৫৭)
১৬। সন্ধ্যামণি (১৩৬৫)
১৭। গাথাঞ্জলি(১৯৬১)
১৮। দন্তরুচি কৌমুদি(১৯৬১)
১৯। আহরণী(নবপর্যায়)(১৯৫২)
২০। শ্রেষ্ঠকবিতা(১৯৬৪)
২১। গাথাকাহিনী(১৩৭১)
২২। পূর্ণাহুতি(১৩৭৫)
২৩। তৃণদল(১৯৭০)
২৪। গাথামঞ্জরী(১৩৮১)
২৫। গাথাবলী(১৯৭৬)
২৬। মনীষী বন্দনা(১৯৭৬)
২৭। কালিদাস রায়ের ছোটদের কবিতা(১৯৮৩)
২৮। দিন ফুরানোর গান (১৯৮৪)
২৯। কাঁটা ফুলের গুচ্ছ (১৯৯২)

* মনীষীবন্দনা পরে ঈষদ পরিবর্তন হয়ে 'মনীষীমঙ্গল' নামে মুদ্রিত

* আহরণী - তারিখ নাই, স্মৃতিকথায় তারিখ উল্লিখিত আছে।

অনুবাদ কাব্য :

৩০। গীতগোবিন্দ (১৯৩০)
৩১। গীতালহরী (১৩৩১)
৩২। কাব্যে শকুন্তলা(১৩৫১)
৩৩। ইন্দুমতী(১৩৫১)
৩৪। কুমারসম্ভব(১৩৬০)
৩৫। ব্রজ-বাঁশরী
৩৬। ঋতুরঙ্গ(যন্ত্রস্থ)
৩৭। মেঘদূত(১৩৭০)

গদ্য সাহিত্য :

৩৮। সাহিত্য প্রসঙ্গ(১ম)(১৯৩১)
৩৯। সাহিত্য প্রসঙ্গ(২য়) তারিখ নেই
৪০। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য (১ম)(১৩৪১)
৪১। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য(২য়)(১৩৫৭)
৪২। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য(৩য়)(১৩৫৮)
৪৩। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়(১ম)(১৩৫৬)
৪৪। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়(২য়)(১৩৫৭)
৪৫। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়(৩য়)(১৯৫২)
৪৬। শরৎসাহিত্য(১ম) (১৯৫৬)
৪৭। শরৎসাহিত্য(২য়) তারিখ নাই
৪৮। পদাবলী সাহিত্য (১৯৫৫)
৪৯। শরৎ সান্নিধ্যে(১৯৭৫)
৫০। বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ
৫১। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও গান(১৯৭৮)
৫২। শাব্দিক (১৯৯১)
৫৩। রবীন্দ্র প্রসঙ্গে

রম্য রচনা :

৫৪। চালচিত্র(১৩৬৮)
৫৫। চণক সংহিতা(১৯৬১)
৫৬। রঙ্গচিত্র (১৯৬৩)
৫৭। কালিদাস রায়ের নির্বাচিত সরস গল্প (১৯৮৯)

কিশোর ও শিশু সাহিত্য

৫৮। ছেলেদের রামায়ণ(১৩৩৬)
৫৯। কুরুরাজ(১৩৪৩)
৬০। ভক্তমালিকা (১৩৪৪)
৬১। জাতক মালিকা(১৩৪৪)
৬২। ভক্তের ভগবান (তারিখ নাই)
৬৩। গল্পমালিকা (তারিখ নাই)
৬৪। কথামালিকা (১৯৩৬)
৬৫। লঙেকশ্বর (তারিখ নাই)

৬৬। কথিকা
৬৭। জাতক কাহিনী
৬৮। ছেলেদের মহাভারত(তারিখ নাই)
৬৯। উৎকলিকা
৭০। পুরাণ কথিকা (১৯৫৪)
৭১। জাতকের গল্প (১৯৫৫)
৭২। পুরাণ কাহিনী (১৯৫০)
৭৩। গল্প কাহিনী (১৯৭৫)
৭৪। গল্প বলি গল্প শোনো (১৩৮০)
৭৫। গল্পমাল্য
৭৬। পুরাণের গল্প
৭৭। গল্পমালা
৭৮। যাঁরা ছিলেন মহাণ
৭৯। সোনার পরশ (১৩৮২)
৮০। ছেলেদের চণ্ডী

পাঠ্য পুস্তক ও ব্যাকরণ :

৮১। প্রাথমিক রচনা ও অনুবাদ
৮২। রচনাদর্শ (২য়)
৮৩। রচনাদর্শ (৩য়)
৮৪। রচনাদর্শিকা
৮৫। নব প্রবেশিকা ব্যাকরণ
৮৬। সংক্ষিপ্ত প্রবেশিকা ব্যাকরণ
৮৭। ব্যাকরণ দীপিকা
৮৮। প্রবেশিকা ব্যাকরণ ও রচনা
৮৯। প্রাথমিক ধর্মবোধ (১৯৩১)
৯০।
৯১। শ্যামাপ্রসাদ
৯২। নব পল্লব
৯৩। কবিতা মালিকা
৯৪। কবিতা মঞ্জরী
৯৫। গল্পাঞ্জলি

সম্পাদিত গ্রন্থ :

১৬। বসুধারা (মাসিক পত্রিকা)

১৭। রসচক্র(বারোয়ারী উপন্যাস)

১৮। অষ্টরম্ভা(১৩৪৫)

১৯। শতনরী(১৩৫৫)

১০০। মাধুকরী(১৩৬১)

১০১। কাব্যমঞ্জুষা(১৩৪৩)

১০২। কাহিনী

১০৩। কুসুমকাব্য সম্ভার

১০৪। মৈত্রী

১০৫। টিচার্স জার্নাল

১০৬। সম্মিলনী

১০৭। সমগ্র পদাবলী সাহিত্য(১৩৮১)

১০৮। কবি কৃত্তিবাস রচিত সপ্তকান্ড রামায়ণ।

কবিশেখরের অপ্রকাশিত রচনাপঞ্জী

১। জীবনস্মৃতি

২। রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা

৩। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

৪। বাংলা ছন্দের কথা

৫। বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (৪র্থ)

৬। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়(আধুনিক পর্ব)

৭। রম্য রচনা(১ম)

৮। রম্য রচনা(২য়)

৯। রম্য রচনা (৩য়)

১০। সমাজ সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী

১১। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী

১২। ভাষা ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী

১৩। বিবিধ প্রবন্ধ

১৪। সাহিত্যিকের সান্নিধ্যে

১৫। গান

১৬। বাংলা অভিধান

১৭। প্রেমের কবিতা সংকলন

১৮। চয়নিকা (শিশু কবিতা)

১৯। নবপল্লব (শিশু কবিতা)

২০। ইংরাজি অনুবাদ

২২। বিদেশী কবিতার অনুবাদ

২২। ছন্দ ও অলঙ্কার

২৪। রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা

২৬। কথা সাহিত্যের আলোচনা

২৮। ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কীয় প্রবন্ধ

৩০। রম্য রচনা

৩২। বিবিধ প্রবন্ধ

২৩। পদাবলী ও বৈষ্ণব সাহিত্য

২৫। বঙ্গসাহিত্যে পরিচয় (আধুনিক পর্ব)

২৭। সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনা

২৯। শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ

৩১। স্মৃতিমূলক রচনা

ক) কবি জীবনের অভিজ্ঞতা

খ) ছাত্রজীবনের স্মৃতি

গ) ছাত্রজীবনের শেষপর্ব

ঘ) শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্র

ঙ) সাহিত্য জীবনের স্মৃতি

চ) আমার ছাত্র জীবন

ছ) মাসিক পত্রের সঙ্গে

জ) একটি কবিতার ইতিহাস

ঝ) স্মৃতিকথা

ঞ) শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

ট) রঙ্গচক্র ও শরৎচন্দ্র

ঠ) মাসিক পত্রের সমালোচনা

ড) মোহিতলালের স্মৃতি

ঢ) অন্যান্য

সূত্র নির্দেশ।।

১. বিনয় ঘোষের চিঠি, কালিদাস রায়কে লিখিত ২০.১২.৫৭

২. মন্মথ রায়ের চিঠি, কালিদাস রায়কে লিখিত, ২৪শে মার্চ ১৯৬৮

৩. বৈকালী কাব্য গ্রন্থের পরিচায়িকা।

৪. শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি কবিশেখর কালিদাস রায়। পৃ.২২

৫. New criticism, Naresh Chandra, Doaba House, New Delhi-6, 1979 p. 16

৬. বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, ১ম খন্ড, সাফরতা প্রকাশন, ১৯৭৩, পৃ.১১৬২

৭. A short history of French Literature, Penguin, 1966, p. 263

৮. উৎসর্গ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খন্ড, পৃ.৯৮

৯. বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, ১ম খন্ড, সাফরতা প্রকাশন, ১৯৭৩, পৃ.১১৬২

১০. সংবর্ধিতের ভাষণ : কালিদাস রায়। (১৮.৮.১৯৫৭, প.ব.প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, কলকাতা)

১১. স্মৃতিকথা মন্দিরা, আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা ১৩৬৩ (পান্ডুলিপি)

১২. সাহিত্য সাধন চরিতমালা, অলোক রায়

১৩. মায়ের দেশে, আহরণী (নব পর্যায়), কালিদাস রায়, পৃ.৩৬

১৪. কবি জীবনের অভিজ্ঞতা, কথাসাহিত্য, মাঘ, ১৩৫৮

১৫. কবি জীবনের স্মৃতিকথা, শ্রাবণ ১৩৫৯ কথাসাহিত্য পৃ.৫৩৭

১৬. শ্রেষ্ঠ কবিতা, কালিদাস রায় পৃ.৫৮

১৭. কবিজীবনের অভিজ্ঞতা, মাঘ ১৩৫৮ কথা সাহিত্য পৃ.২০৪

১৮. কবি জীবনের অভিজ্ঞতা, মাঘ, ১৩৫৮, কথাসাহিত্য

১৯. কবি জীবনের অভিজ্ঞতা, মাঘ, ১৩৫৮ কথাসাহিত্য।

২০. কাশিম বাজারের ছাত্র জীবন, মন্দিরা, শ্রাবন, ১৩৫৯

২১. স্মৃতিকথা মন্দিরা শ্রাবণ ১৩৫৯

২২. স্মৃতিকথা (পান্ডুলিপি)১৩৬৩ মন্দিরা

২৩। স্মৃতিকথা, কার্ত্তিক, ১৩৬৩ মন্দিরা, পৃ·৫১৭

২৪। স্মৃতিকথা, মন্দিরা ফাল্গুন ১৩৬০

২৫। ঐ

২৬। স্মৃতিকথা, মন্দিরা চৈত্র ১৩৬০

২৭। ঐ

২৮। স্মৃতিকথা, মন্দিরা মাঘ, ১৩৬৪

২৯। ১৪·২·১৯২৮ তারিখে লেখা পত্র, হরিদাস ভট্টাচার্য।

৩০। স্মৃতিকথা, কথাসাহিত্য, ভাদ্র, ১৩৫৯

৩১। সংবর্ধনা ভাষণ, প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত, ১৮·৮·১৯৫৭

৩২। স্মৃতিকথা, মন্দিরা, মাঘ ১৩৫৮

৩৩। স্মৃতিকথা, মন্দিরা, মাঘ, ১৩৫৮, পৃ·৫৩৯

৩৪। স্মৃতিকথা, শ্রাবণ, ১৩৫৯ কথাসাহিত্য, পৃ·৫৩৯

৩৫। সংবর্ধনার উত্তর ভাষণ, কংগ্রেস আয়োজিত, ১৮·৮·১৯৫৭

৩৬। সংবর্ধনা ভাষণ, কংগ্রেস, আয়োজিত ১৮·৮·১৯৫৭

৩৭। স্মৃতিকথা, মাঘ ১৩৫৮ কথাসাহিত্য, পৃ·২১০

৩৮। কথাসাহিত্য, ফাল্গুন ১৩৫৮ [স্মৃতিকথা]

৩৯। স্মৃতিকথা, মন্দিরা ফাল্গুন ১৩৫৮

৪০। স্মৃতিকথা, কালিদাস রায়, পাণ্ডুলিপি

৪১। স্মৃতিকথা, মন্দিরা শ্রাবণ ১৩৫৯

৪২। স্মৃতিকথা, মন্দিরা মাঘ ১৩৬০

৪৩। স্মৃতিকথা, মন্দিরা বৈশাখ ১৩৬৫

৪৪। স্মৃতিকথা, মন্দিরা, মাঘ ১৩৬০

৪৫. স্মৃতিকথা, কথাসাহিত্য, ভাদ্র ১৩৬১

৪৬. স্মৃতিকথা, বৈশাখ ১৩৬৭, মন্দিরা (পাণ্ডুলিপি)

৪৭. ভূমিকা, পদাবলী সাহিত্য, কালিদাস রায়

৪৮. মন্দিরা ১৩৬৫, মাঘ-ফাল্গুন

৪৯. রসচক্র সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন, মন্দিরা, ১৩৬৫

৫০. ঐ

৫১. ঐ

৫২. কবিশেখরের পত্র বৈশাখ ১৩৫৮ (পাণ্ডুলিপি)

৫৩. Letter, Registrar, Jadavpur University, Ref. E-11/9/62 dt. 22.12.62

৫৪. শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি, কবি শেখর কালিদাস রায় পৃ.৬৮

৫৫. সঙ্গপ্রসঙ্গ, শ্রীমতী বাণী রায়, কবিশেখর কালিদাস রায় সঙ্গ ও প্রসঙ্গ পৃ.৭৭

৫৬. সঙ্গ প্রসঙ্গ, নন্দগোপাল সেন, কবিশেখরের তিরোধানে দিনেশ দাস পৃ.২০১

৫৭. ঐ ঐ কালীদা, মনোজ বসু পৃ.১৯৭

৫৮. এঐ ঐ সেই তিনি, রমাপদ চৌধুরী পৃ.২১৪

৫৯. ঐ ঐ কবিশেখর, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য পৃ.১৮

৬০. ঐ ঐ প্রাচীন বট, হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায় পৃ.২০৬

৬১. স্মৃতিকথা, মন্দিরা, মাঘ ১৩৬৭

৬২. সন্ধ্যামণি, কবিশেখর কালিদাস রায়

৬৩. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, অলোক রায়

৬৪. আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬.১০.১৯৭৫